আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আবেদন

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন

২৩ মার্চ, ২০২৬

প্রকাশক ঃ চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

যোগাযোগ ঃ ৮৯১০৪২৩৫৪৭, ৮৯০২৩৮৭৬৯২,
ই-মেল: suci.wb@gmail.com

মুদ্রণ ঃ গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ১০ টাকা

প্রকাশকের কথা

এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিন ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় চায়ের দোকানে, ট্রেনে বাসে, অফিস কাছারিতে ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ভোট নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। মেন স্ট্রিম মিডিয়াতেও এখন ভোটের প্রচার বৃহত্তর পরিসর নিতে শুরু করেছে। কে কাকে ঠেকাবে, কে কাকে হারাবে, কে সরকার গঠন করবে, কার সঙ্গে জোট করলে নির্বাচনে কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে— এই নিয়ে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক জোর কদমে চলছে। কিন্তু কোনও দলকে কেন ভোট দেব, সে সম্পর্কে গভীর ভাবনার অভাব চোখে পড়ার মতো। যারা এখন রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় রয়েছে, তাদের অপশাসনে, দুর্নীতিতে তিতিবিরক্ত হয়ে যাকে আনবার কথা কেউ কেউ ভাবছেন, তারাও কেন্দ্রীয় সরকারে থেকে যে জনবিরোধী ভূমিকা নিয়েছে তা পরীক্ষিত। এই সব বিচারের প্রশ্ন পিছনে থেকে যাচ্ছে। এই দলগুলির কোনও একটি সরকারি ক্ষমতায় এলে অবস্থার যে কোনওরূপ পরিবর্তন হবে না, তা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতাতে নেই এমন নয়। কিন্তু প্রচারের পরিকল্পিত বন্যায় তাকে পিছনে ফেলে দিচ্ছে। আর, মানুষের দাবি অর্জনের একমাত্র রাস্তা যে একটা নীতিভিত্তিক গণআন্দোলন, সে কথাকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাই ভোট দেওয়ার আগে আমরা কোন মাপকাঠিতে দল বিচার করব, সেটা আপনার-আমার স্বার্থে বুঝে নেওয়া জরুরি। ইতিহাস ও যুক্তি-বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে আমরা এই বিষয়টি এই পুস্তিকায় তুলে ধরেছি।

আমারা বিপ্লবী বামপন্থী দল হিসাবে একদিকে যেমন একটার পর একটা গণআন্দোলন গড়ে তুলছি, তেমনই আসন্ন নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যক আসনে এবং বামপন্থী দল হিসাবে একক শক্তিতে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। কোন বক্তব্যের ভিত্তিতে আমরা আমাদের দলের প্রার্থীদের জয়ী করার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি সে সম্পর্কে একটা আলোচনা এই পুস্তিকায় করা হয়েছে। আশা করি, নির্বাচনে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত স্থির করতে এই পুস্তিকা জনগণকে সাহায্য করবে।

ধন্যবাদ সহ

চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য

সম্পাদক

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

২৩ মার্চ, ২০২৬

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে

পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস
সাম্প্রদায়িক স্বৈরতান্ত্রিক বিজেপি ও
চূড়ান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত জনবিরোধী তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করুন

শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষের
বিপ্লবী বামপন্থী গণআন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে

এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন

বন্ধুগণ,

দেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রতিষ্ঠান হওয়ার দাবিদার হলেও নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কাজ অসমাপ্ত রেখে এবং ৬০ লক্ষ ভোটারকে বিচারাধীন তকমা দিয়ে তাদের ভোটাধিকারের বিষয়টি অনিশ্চিত রেখেই বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে। গত প্রায় চার মাস ধরে বিপুল সংখ্যক মানুষকে চূড়ান্ত হয়রানি করে নির্বাচন কমিশন এস আই আর-এর মধ্য দিয়ে যে তুঘলকি কাণ্ড করেছে, তার জন্য সুপ্রিম কোর্টও তাদের তিরস্কার করেছে। রাজ্যের মানুষের কাছে এটা পরিষ্কার যে, ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা তৈরির ঘোষিত উদ্দেশ্যের বাইরেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কোনও গোপন অ্যাজেন্ডা এর পিছনে কাজ করেছে।

এই প্রেক্ষাপটেই এবার পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচনে আপনি যখন ভোট দিতে লাইনে দাঁড়াবেন, কোন মাপকাঠিতে সঠিক দল এবং প্রার্থী বিচার করবেন? কোন দল সবচেয়ে লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি দিল তা দেখবেন, কোন দলের জাঁকজমক বেশি, নামী দামি নেতা বেশি, টাকার জোর বেশি, মস্তান-পুলিশ মাফিয়াদের হাতে রাখার শক্তি বেশি, তা দেখবেন? কে কটা মন্দির মসজিদ তৈরি করল, কিংবা ভাঙল, কে বেশি করে বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক কথার ফুলঝুরি ছোটাতে পারল, অন্য দলের নেতা-নেত্রীকে কত বাজে গালাগালি দিতে পারল, কে ভাতা-খয়রাতির বাজারে বেশি টাকা হাঁকল— এই সব দেখবেন?

নাকি দেখবেন আপনার জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোর কথা কোন দলের প্রার্থী সবচেয়ে ভালভাবে তুলে ধরতে পারে, কারা সেগুলি সমাধানের জন্য লড়াইয়ে সারা বছর

সচেষ্ট থাকে, কোন দলের রাজনীতি খেটে খাওয়া মানুষের ইজ্জত কেনার চেষ্টার বদলে তাদের রক্ত ঘামের যথার্থ মর্যাদা দিতে পারে। কোন সে দল যারা খেটে খাওয়া মানুষের লড়াইতে যেমন রাস্তায় পাশে থাকে, নেতৃত্ব দেয়, তেমনই বিধানসভার ভিতরেও এই লড়াইয়ের কণ্ঠ হয়ে উঠে মানুষের কথাকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে পারে। ভোটে আপনার সমর্থনের বিচারটা এর ভিত্তিতেই হওয়া দরকার নয় কি?

ভোটে দল বিচারের মাপকাঠি ঠিক করার প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

দল বিচারের মাপকাঠি ঠিক করার প্রশ্নটা প্রথমেই আসছে কেন? আসছে, কারণ টিভি চ্যানেলের সান্ধ্য বিতর্কে, খবরের কাগজের পাতা জোড়া বিজ্ঞাপনে আপনি যে সমস্ত দলের নেতাদের মুখ প্রতিনিয়ত দেখেন তাঁরা কেউ কি ভুয়ো প্রতিশ্রুতি, খয়রাতি, সাম্প্রদায়িক উস্কানি, টাকা-মদ ছড়িয়ে ভোট কেনার প্রতিযোগিতায় একে অপরের থেকে কিছু কম যান! ঝান্ডার রং আর দলের সাইনবোর্ডের পার্থক্য ছাড়া অন্য কোনও মাপকাঠিতে তাদের যে আলাদা করা যায় না, তা কি আপনি অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেন না? এই সব দলের অতি বড় সমর্থকও মুখে যাই বলুন না কেন, অন্তর থেকে মানতে পারবেন না যে, নিজেদের আখের গোছানো ছাড়া তাদের নেতারা জনস্বার্থে কোনও বিষয় নিয়ে সত্যিই ভাবেন! ভাবলে এই দলগুলির কার্যক্রমে জনগণের মূল সমস্যাগুলি সমাধানের কিছু কথা তো উঠে আসত? সে ক্ষেত্রে প্রতিদিন জীবনযন্ত্রণায় জ্বলেপুড়ে জেরবার হওয়া মানুষের সামনে এই নেতারা সমস্যা সমাধানের কোনও রাস্তা দেখানোর চেষ্টাটা অন্তত করতেন। কিন্তু তাঁরা বলেন — আমাকে ভোট দিয়ে গদিতে বসাও, তোমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে! ভোটের সময় জনসেবকের ভেকধারী নেতা ১৯৫২ সাল থেকে হরেক নির্বাচনে মানুষ কম দেখেনি, এই ধরনের প্রতিশ্রুতিও কম শোনেনি। এ বারেও দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবাসীকে খোলা চিঠি দিয়ে বলেছেন একটি বার সেবার সুযোগ দিন! তৃণমূল কংগ্রেসও এখন আপনার সেবক সাজছে, কংগ্রেস সহ অন্য দলের নেতারাও এই রকম সেবকের বেশে হাজির। আপনি এদের যতবার বিশ্বাস করেছেন তত বারই কি ঠকেননি?

ভোটে জিতে নেতা-মন্ত্রীরা, সাংসদ বিধায়করা বিধানসভা, লোকসভা, রাজ্যসভায় জনস্বার্থের প্রকৃত বিষয় নিয়ে কোনও আলোচনা করেন? আজ ভারতের সংসদের সাধারণ চিত্র হল হই-হট্টগোল, সাম্প্রদায়িক স্লোগান, বিনা আলোচনায় বিল পাশ, বিরোধীদের পাইকারি হারে সাসপেন্ড করে সরকারি বিল পাশ করিয়ে নেওয়া। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে শাসক তৃণমূল এবং বিরোধী বিজেপি দুই দলের নেতারাই বিধানসভার শেষ অধিবেশনে অন্তর্বর্তী বাজেটের খুঁটিনাটির বদলে হিন্দু-মুসলিম বিভেদ এবং সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বতেই মেতে থেকেছেন। এমনকি বিরোধী দলনেতার মুখে শোনা গেছে জিতলে তারা নাকি সমস্ত মুসলিম বিধায়ককে চ্যাংদোলা করে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন!

মনে পড়ে যায়, মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের কথা, তিনি বলেছিলেন— 'ইলেকশন হচ্ছে একটা বুর্জোয়া পলিটিক্স। জনগণের রাজনৈতিক চেতনা না থাকলে, শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম এবং শ্রেণিসংগঠন না থাকলে, গণআন্দোলন না থাকলে, জনগণের সচেতন সংঘশক্তি না থাকলে শিল্পপতিরা, বড় বড় ব্যবসায়ীরা, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা বিপুল টাকা ঢেলে এবং সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে যে হাওয়া তোলে, যে আবহাওয়া তৈরি করে, জনগণ উলুখাগড়ার মতো সেই দিকে ভেসে যায়' (১৯৭৪-এ শিক্ষাশিবিরে ভাষণ)।

পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে ভোটবাজ দলগুলির নেতাদের প্রচার দেখলে বোঝা যায় যে, এই কথাটা কত বড় সত্যকে তুলে ধরেছে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক দিকে তৃণমূল সরকারের তরফে খয়রাতি ঘোষণার জোয়ার চলছে, অন্য দিকে বিজেপি তো বটেই, এমনকি সিপিএমও সেই জোয়ারের জল মাপতে ক্ষমতায় এলে কত খয়রাতি বাড়াবে তা নিয়ে পাল্টা নিলাম হাঁকার মতো প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বিজেপি ব্যস্ত কখনও লক্ষ লক্ষ, কখনও কোটি কোটি, 'অনুপ্রবেশকারী' ও 'রোহিঙ্গা' ধরার প্রচারে। অথচ বিজেপির নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কোন অপদার্থতায় এত অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়তে পারল, সে কথায় তারা নীরব। বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে তাদের ভোট যাত্রার নাম দিয়েছে 'পরিবর্তন যাত্রা'। কিন্তু এগারো বছরের বেশি কেন্দ্রীয় সরকার চালিয়ে সারা ভারতে তারা কংগ্রেসী ধারাতেই মানুষের আরও যন্ত্রণা বৃদ্ধি করা ছাড়া কী পরিবর্তন এনেছে, তার উত্তর বিজেপি নেতাদের কাছ থেকে চাওয়া দরকার। নির্বাচন কমিশনকে ঢাল করে এস আই আর-এর নামে এক দিকে বিজেপি মুসলিম বিরোধী জিগির তুলে এবং বৈধ ভোটারদেরও বাদ দিয়ে নির্বাচনে জিততে চাইছে। অন্য দিকে তৃণমূল কংগ্রেস ভোটারদের আতঙ্ককে কাজে লাগিয়ে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে যাতে মানুষ তাদের মুখাপেক্ষী হয়েই থাকে। এই টানা পোড়েনে সাধারণ মানুষ ছুটছে নাগরিকত্ব চলে যাওয়ার আতঙ্কে। তাদের জীবনের জ্বালা যন্ত্রণাকে এই ভাবে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

ভোট এলেই আর একটা প্রশ্নকে অবধারিত ভাবে মানুষের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়ানো হতে থাকে, কাকে হারাতে হলে কাকে ভোট দিতে হবে। এটাই নাকি পরিবর্তন! দুটো পক্ষকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে এমন ভাবে মানুষের কাছে উপস্থাপন করা হয়, যেন এরাই একে অপরের বিকল্প। যেন এদের মধ্যেই একজনকে বেছে নিতে হবে! এক দলের বিরুদ্ধে মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলে দেশের আসল মালিক পুঁজিপতি শ্রেণি তাদেরই সেবাদাস আর একটি দলকে সামনে নিয়ে এসে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে মানুষকে বোঝায় এরাই পারবে ওই দলকে হারাতে। দুই পক্ষকেই দরাজ হাতে টাকা জোগায় পুঁজিপতি শ্রেণি। সাধারণ মানুষ এই সব খতিয়ে না দেখে ভাবে, অন্যরা যে আসে আসুক, এরা তো যাক! পশ্চিমবঙ্গের এ বারের বিধানসভা নির্বাচনও তার ব্যতিক্রম নয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসনে
আজ অতিষ্ঠ মানুষ

রাজ্যের সরকারি গদিতে আসীন তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনে বীতশ্রদ্ধ মানুষ। জনজীবনের কোনও একটা সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকরী কোনও পদক্ষেপ এই সরকার নিয়েছে কি? জিনিসপত্রের দাম যে ভাবে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, তা নিয়ে এ রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীদের কোনও মাথাব্যথা আছে কি? পাশাপাশি কৃষক জীবনের সংকট ক্রমবর্ধমান। সার কীটনাশক সহ চাষবাসের উপকরণের দাম বেড়েই চলেছে। আলু সহ কোনও ফসলের ন্যায্য দাম চাষিরা পাচ্ছে না। তার উপর পুলিশ প্রশাসনের চোখের সামনেই চলছে কালোবাজারি। সেই কারণেই চাষের খরচ উত্তরোত্তর বাড়ছে। ফলে চাষিরা অনেক সময় আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

কর্মসংস্থান তলানিতে। বেকারের সংখ্যা এই রাজ্যে বেড়েই চলেছে। অথচ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। নতুন কলকারখানা তৈরি হচ্ছে না। বরং বহু চালু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে কর্মরত শ্রমিকরাই ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে। অথচ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। তার পরিবর্তে যুবশ্রী, কন্যাশ্রী, যুবসাথী, লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রভৃতি হরেক রকম অনুদান দেওয়ার ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী দায় সারছেন।

এর সাথে শাসক দলের নেতা-কর্মীদের চুরি-দুর্নীতি, অপশাসন, তাদের শাসনে ক্রমবর্ধমান। প্রশাসন-পুলিশের দলদাসত্ব, তোলাবাজি, সিন্ডিকেটের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানুষ। নারী নির্যাতন এখন নতুন মাত্রা পেয়ে গেছে। কোথাওই মেয়েদের কোনও নিরাপত্তা নেই। আরজিকর হাসপাতালে কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তারকে যে ভাবে হাসপাতালের মধ্যেই খুন ও ধর্ষণ করা হল, তা এক কথায় নজির বিহীন। দেখা গেল এই হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনার সাথে যুক্ত রয়েছে ওই হাসপাতালের তৎকালীন অধ্যক্ষ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তা ব্যক্তিরা। কর্তৃপক্ষ প্রথমে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করলেও ঐ হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার, নার্স ও আমাদের দলের মেডিকেল ইউনিটের কর্মীদের তৎপরতায় তা সফল হতে পারেনি। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে উত্তাল আন্দোলন গড়ে উঠলেও প্রকৃত দোষীদের রাজ্য সরকার আড়াল করে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ প্রকাশ পেয়েছে এই মর্মান্তিক ঘটনার সাথে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি জড়িয়ে আছে। শুধু ওই কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ নন, স্বাস্থ্য দপ্তরের অনেক রাঘব বোয়ালরাও সীমাহীন দুর্নীতিতে যুক্ত। তাদের কেউ কেউ জেলও খাটছেন। শুধু স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি নয়, শিক্ষক নিয়োগেও দুর্নীতি প্রকাশ্যে চলে এল। দুর্নীতির দায়ে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী সহ শিক্ষা দপ্তরের বহু কর্মকর্তাও জেল খেটেছেন। দুর্নীতি কি শুধু স্বাস্থ্য বা শিক্ষা দপ্তরে সীমাবদ্ধ? আজ প্রায় সমস্ত সরকারি দপ্তর দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। আর এইসব দুর্নীতির

সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে সরকারি দলের নেতা মন্ত্রীরা। কয়লা পাচার, বালি পাচার, গরু পাচারের মতো দুর্নীতিতে শাসক দলের অসংখ্য নেতা একেবারে ডুবে আছে। রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পদে পদে দলিত হয়ে চলেছে।

একই সাথে একদিকে স্থায়ী সরকারি চাকরির কার্যত অবলুপ্তি, অন্য দিকে স্কুল থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত চরম অব্যবস্থা। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের চাকরি বেচে টাকা লুঠ করার ধাক্কায় রাজ্যের প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্কুল স্তরের শিক্ষায় তৈরি হয়েছে গুরুতর সংকট। স্কুলগুলোতে উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই, হাজার হাজার শিক্ষক পদ শূন্য। ফলে পড়াশুনার পরিবেশটাই নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। অভিভাবকরা অনেকেই আয়ত্তের বাইরে গিয়েও তাদের ছেলেমেয়েদেরকে বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করতে বাধ্য হচ্ছেন। আর ছাত্র নেই এই অজুহাতে ইতিমধ্যেই ৮২০৭ টি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষাও হয়ে পড়েছে ব্যয়বহুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচন শেষ কবে হয়েছে তা শাসক দলের নেতারাও মনে করতে পারবেন না। রাজ্যের আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড-ডে মিল কর্মীদের ওপর একদিকে সরকারি বঞ্চনা, অন্য দিকে তাঁদের আন্দোলনের ওপর পুলিশ-প্রশাসন-শাসক দলের নেতাদের জুলুম, অত্যাচার চলছে।

আবার আমরা দেখছি, উত্তরবঙ্গে একের পর এক চা বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চালু বাগানের শ্রমিকদের কাগজে কলমে দৈনিক মজুরি মাত্র ২৫০ টাকা, তা-ও সব শ্রমিক এটা পায় না। দিনে ৬০০ টাকা বা মাসে ১৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবি অতীতে সিপিএম সরকারের মতো তৃণমূল সরকারও মানেনি। বাগানে স্থায়ী শ্রমিক কথাটাই প্রায় নেই। পিএফ, ইএসআই, স্বাস্থ্য পরিষেবা সবই অনিশ্চিত। মালিকরা চা বাগান চালানোর বদলে ফড়েদের মাধ্যমে চাষিদের কাছ থেকে পাতা কিনে তা ফ্যাকটরিতে প্রসেসিংয়ের দিকেই ঝুঁকছে। অথচ চাষি কাঁচা পাতা বিক্রি করার সময় ফড়েরা তার দাম প্রতিদিন কমায়। বহু ক্ষেত্রে চাষিদের চা পাতা তোলার খরচও এই দামে ওঠে না। রাজ্য সরকারেরও কোনও উদ্যোগ নেই। বন্ধ চা বাগানের শ্রমিককে বসে থাকতে হয় রেশনের চালের ভরসায়, জোটে না সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের প্রাপ্য। ব্যক্তি চাষির অবস্থাও তাই।

এর সাথে রাজ্যের শাসক দল কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির সাথে পাল্লা দিয়ে শুরু করেছে ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি। হিন্দু ভোটকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য তারা এক দিকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে জগন্নাথ মন্দির, দুর্গা ও মহাকাল মন্দির নির্মাণ করছে, জনগণের ট্যাক্সের টাকার অপচয় করে দুর্গা পূজার সময় ক্লাবগুলোকে অনুদান দিচ্ছে, দুর্গা পূজার কার্নিভাল করছে। অন্য দিকে বিজেপির উগ্র হিন্দুত্বের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত মুসলিম ভোটারদের কাছে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মুসলিম ভোটের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করার কৌশল নিয়েছে। ফলে বিজেপি আজ সারা দেশে যে সাম্প্রদায়িক ঘৃণার বাতাবরণ তৈরি করেছে, তৃণমূল তাকে বাড়তেই সাহায্য করছে।

বিজেপি কি তৃণমূলের বিকল্প?

স্বাভাবিকভাবেই আজ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের মানুষের মধ্যে প্রবল তৃণমূল বিরোধী মন তৈরি হয়েছে। অনেকেই ভাবছেন তৃণমূলকে হারিয়ে অন্য কাউকে ক্ষমতায় বসালেই বুঝি তাদের জীবনের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির নামটাই চলে আসছে। কেউ কেউ একচেটিয়া পুঁজি পরিচালিত সংবাদ মাধ্যমের সংগঠিত প্রচারে ভাবছেন, বিজেপিকে একবার দিয়েই দেখা যাক না।

কিন্তু সত্যিই কি রাজ্যের মানুষ বিজেপিকে দেখেননি? একবার নয়, লোকসভার তিনটে নির্বাচনে আপনারা বিজেপিকে দেখেছেন। মোট প্রাপ্তি কী? একবারও ভেবে দেখেছেন কি? কোথায় গেল প্রধানমন্ত্রীর বছরে দু'কোটি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি? কোথায় গেল প্রত্যেক ভারতবাসীর ব্যাংক একাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা পৌঁছে যাওয়ার স্বপ্ন? এটা যে একটা প্রতারণা ছিল, তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি মন্তব্যেই পরিষ্কার হয়ে গেল। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেই ফেললেন যে, এটা ছিল নেহাতই একটা 'জুমলা'। আর মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনও পদক্ষেপ নিয়েছেন কি? পরিসংখ্যানে কারচুপি করে মূল্যবৃদ্ধির সূচককে কম দেখানোর প্রচেষ্টা ছাড়া বাস্তবে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে তাঁরা কার্যকরী কোনও ব্যবস্থাই নেননি। শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থেও তাঁরা কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেন নি। বরং কেন্দ্রীয় সরকার চারটি শ্রমকোড চালু করে শ্রমিকদের বহু আন্দোলন ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত অধিকার কেড়ে নিয়েছে। নতুন নতুন কলকারখানা তৈরি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কোনও পরিকল্পনা তো নেইই, চালু কারখানাগুলোও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রেল, ব্যাংকের মতো বৃহৎ কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোতে নতুন নিয়োগ প্রায় বন্ধ। যতটুকু নিয়োগ হচ্ছে, তার বেশিরভাগই অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক। এখন স্থায়ী কাজ বা আট ঘণ্টার কর্মদিবস অতীতের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে দেশের যুবকদের সামনে বেকার সমস্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সারা দেশে বেকারত্বের হার নরেন্দ্র মোদির শাসনকালে অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু এর জন্য বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের কোনও মাথাব্যথা নেই। তারা কেবল পরিসংখ্যানের কারচুপি করে বেকার সমস্যাকে কমিয়ে দেখাতে ব্যস্ত। আর বাস্তবে আমরা দেখছি, বেকার যুবকরা কাজের সন্ধানে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটছে, এমন কি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। অথচ এই পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য কোনও সরকারি উদ্যোগ নেই। বরং আমরা দেখছি, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলায় কথা বললেই 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে, এমনকি প্রাণে মেরে ফেলা হয়েছে। লকডাউনের সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার পথে মর্মান্তিক মৃত্যুর স্মৃতি এখনও ফিকে হয়ে যায়নি।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রায় প্রতিটি বক্তৃতায় নিজেকে কৃষক-বন্ধু বলে পরিচয় দেন। অথচ কৃষকের চাষের খরচ যে বেড়েই চলেছে তার জন্য বিজেপি সরকার কি কোনও পদক্ষেপ নিয়েছে? কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার কোনও ব্যবস্থা করেছে? প্রতি বছর যে

শত শত কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন, তার প্রতিকারের জন্য তারা কোনও পদক্ষেপ নিয়েছে কি? বরং কৃষিক্ষেত্র যাতে কর্পোরেট পুঁজির শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে, তার জন্য তাঁরা তিনটি কৃষি আইন প্রণয়ন করেছিলেন। প্রায় সাত শতাধিক কৃষকের জীবনের বিনিময়ে কৃষকরা লাগাতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা রদ করতে সক্ষম হয়েছে। দেশি বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কৃষক, মৎস্যজীবী, পশুপালক সহ সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে আমেরিকার সাথে 'ট্রেড ডিলে' চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এর ফলে খাদ্যশস্য, দুধ ও দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্যের বাজার দখল করে নেবে মার্কিন বহুজাতিক পুঁজি। স্বভাবতই, এ দেশের কৃষকরা সীমাহীন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে। শুধু তাই নয়, আমেরিকার নির্দেশে রাশিয়ার কাছ থেকে সস্তায় তেল আমদানি বন্ধ করে বাড়তি দামে আমেরিকা থেকে তা কিনতে সম্মত হয়েছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। এর উদ্দেশ্য কী? একমাত্র উদ্দেশ্য হল একচেটিয়া পুঁজির সেবা করা। আমেরিকার কাছ থেকে কোটি কোটি টাকার অস্ত্র কিনতে ইতিমধ্যেই তারা চুক্তি করেছে। এ দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দীর্ঘ ঐতিহ্যকে পদদলিত করে তারা আমেরিকা ও ইজরায়েলের ইরান আক্রমণের ঘটনায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে কার্যত যুদ্ধবাজ ও নরহত্যাকারী এই দুই দেশকে সমর্থন করেছে।

বিজেপির শাসনে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার কী পরিণতি হয়েছে তা কি আপনারা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারছেন না? বিজেপি শাসিত উত্তর প্রদেশে স্কুল 'ক্লোজার অ্যান্ড মার্জার' হচ্ছে ২৭ হাজার, রাজস্থানে ১৯ হাজার ৫০০, মহারাষ্ট্রে ১৫ হাজার, গুজরাটে ৭ হাজার। এই ভারতে গত পাঁচ বছরে ৬৫ লক্ষ ৭০ হাজারের বেশি শিশু স্কুল ছুট হয়েছে প্রাথমিক স্তরেই। অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ভেঙে দিয়ে নরেন্দ্র মোদির সরকার পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ করার জন্য দেশের মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০। এর মধ্য দিয়ে স্কুল স্তর থেকে শুরু করে একেবারে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সিলেবাসকে ঢেলে সাজানোর নামে নানা অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক জিনিস তারা সিলেবাসে ঢুকিয়েছে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও সেমিস্টার ব্যবস্থার ফলে স্কুল শিক্ষায় ছাত্ররা বুনিয়াদি জ্ঞান থেকেই বঞ্চিত হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষা ঐচ্ছিক করে দিয়ে বিরাট সংখ্যক ছাত্রের শিক্ষায় ইতি টানার ব্যবস্থা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে বিজেপি শুধু মাত্র শিক্ষা ব্যবস্থাতেই নয়, মানুষের যুক্তিবাদী চিন্তার ভিত্তিমূলে আঘাত হেনে চলেছে।

বিজেপি নেতারা এখন বাংলার মানুষের কাছে ডবল ইঞ্জিন তত্ত্ব ফেরি করে বেড়াচ্ছেন। যেন কেন্দ্রে রাজ্যে একই দল ক্ষমতায় থাকলে রাজ্যের মানুষের দুর্দিন চলে যাবে। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সহ ১৫টি রাজ্যে তো এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার। ওই নেতাদের প্রশ্ন করুন, এই রাজ্যগুলোতে সাধারণ মানুষের এত দুঃখ দুর্দশা কেন? কেন সেখানে নারী নির্যাতন বাড়ছে? উন্নাও, কাঠুয়া, হাথরস, বিলকিস বানো, সাক্ষী

মালিকদের ঘটনা তো বিজেপি শাসনেই ঘটেছে। তাদের প্রশ্ন করুন, জিনিসপত্রের দাম কেন এত আকাশচুম্বী। বেকার যুবকরা কেন মাঝে মাঝেই বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে? কৃষকরা কেন আত্মহত্যা করছে? শ্রমিকরা বিজেপি শাসিত রাজ্যে নির্যাতনের শিকার কেন? এই সব রাজ্যে শাসক দলের মদতে তোলাবাজি পশ্চিমবাংলাকে লজ্জা দেবে। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি সরকারের মদতেই তো সারা দেশে খনিজ, বনজ ও জল সম্পদের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ দখল ও তার যথেচ্ছ ব্যবহার করে ধনকুবের গোষ্ঠীগুলোকে বিপুল মুনাফা লোটার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে কোটি কোটি জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের জীবন জীবিকা থেকে উৎখাত হয়ে যাচ্ছে।

আর দুর্নীতি? ব্যাপকতায় মধ্যপ্রদেশে ব্যাপম দুর্নীতির সমকক্ষ আর কেউ হতে পেরেছে কি? বিজেপির উচ্চ স্তরের নেতাদের দুর্নীতি চাপা দেওয়ার জন্য ৪৮ জন মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু দুর্নীতির সাথে যুক্ত রাঘব বোয়ালদের একজনেরও শাস্তি হয়নি। সমস্ত বিজেপি শাসিত রাজ্যেই দুর্নীতি আজ জলভাত হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের কারওর বিরুদ্ধে সিবিআই, ইডি কোনও তদন্ত করেনি। কোনও বিজেপি নেতাকে দুর্নীতির দায়ে জেলে যেতে হয় নি। কারণ তাদের মাথার উপর নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহের হাত আছে। এই কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো কার্যত বিরোধীদের শায়েস্তা করতে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিজেপি যাদের বিরুদ্ধে একসময় দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিল, এরকম ২৫ জন এখন বিজেপির রত্ন। তাদের মধ্যে বিজেপির বিচারে এক সময় চরম দুর্নীতিগ্রস্ত হিসাবে ধিক্কৃত হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নামাঙ্কিত পিএম কেয়ার ফান্ডের কোনও হিসেব দেওয়া হয়নি। বলে দেওয়া হয়েছে যে, এর কোনও হিসেব দেওয়া হবে না। এটাও কি বড় ধরনের দুর্নীতি নয়? আর একটা বড় দুর্নীতির ক্ষেত্র হল ইলেক্টোরাল বন্ড । নরেন্দ্র মোদি সরকার আইন করে সমস্ত কিছু গোপন রাখার ব্যবস্থা করেছিল, তার জন্য সুপ্রিম কোর্টেও তারা তিরস্কৃত হয়েছে। ফলে ভেবে দেখুন, বিজেপির নেতারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে যতই হুঙ্কার ছাড়ুন, তাঁরা কি সত্যিই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেন?

S I R চালু করে বিজেপি রাজ্যের নাগরিকদের নাগরিকত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলে চরম হয়রানি করছে

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (S I R) শুরু করার পরে গত প্রায় চারমাস ধরে নির্বাচন কমিশন যেভাবে বৈধ নাগরিকদের হয়রানি করছে তা নজিরবিহীন। শত শত বছর ধরে যাদের পূর্ব পুরুষরা বংশ পরম্পরায় এই রাজ্যে বাস করে আসছে, তাদের নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে বা 'বিচারাধীন' তালিকায় রেখে দিচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্বাচন কমিশন কথিত এক অদ্ভুত 'লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি'র চক্করে পড়ে দিনের পর দিন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয়

শাসক দলের অ্যাজেন্ডাকে চরিতার্থ করার স্বার্থে এস আই আর-এর নামে যে আয়োজন করেছে তাতে ভোটার তালিকা পরিমার্জনের বদলে নাগরিককে নির্যাতন করাটাই যেন হয়ে উঠেছে প্রধান লক্ষ্য। বিজেপির অ্যাজেন্ডা অনুযায়ী চলে নির্বাচন কমিশন মৃত, স্থানান্তরিত, দু'জায়গায় নাম থাকার কারণ দেখিয়ে ইতিমধ্যেই প্রায় ৬৪ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিয়েছে। দেখা গেছে জীবিত ভোটারদের কারো কারোর নাম মৃত দেখানো হয়েছে। তার উপর ৬০ লক্ষ ভোটার বিচারাধীন। তাদের বিচার কবে শেষ হবে তা জানা নেই। দেখা গেছে, নাম বাদ পড়েছে বা 'বিচারাধীন' তালিকায় আছে অতি দরিদ্র, সংখ্যালঘু, মতুয়া, জনজাতি ও চা বাগানের শ্রমিকরা। এই বিপুল সংখ্যক ভোটারের ভোটাধিকার ছাড়াই এবার নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এর আগেও বিভিন্ন দলের সরকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু যে ভোটাধিকার মানুষের পবিত্র অধিকার বলে প্রচার করা হয়, সেই ভোটাধিকার থেকে এক অংশের মানুষকে বঞ্চিত করার এই কৌশল বিজেপি ছাড়া আর কেউ নিতে পেরেছে কি?

বিজেপি এদেশের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে বাড়িয়ে তুলে হিন্দু ভোটকে নিশ্চিত করতে চাইছে এরা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী

ফলে যারা ভাবছেন, তৃণমূলের অপশাসন থেকে মুক্ত হতে হলে বিজেপিকে আনতে হবে, তাঁরা কি ঠিক ভাবছেন? তৃণমূল যে সমস্ত জনবিরোধী পদক্ষেপ নিয়েছে বলে আপনি পরিবর্তন চাইছেন, তার কোনও একটি ক্ষেত্রেও কি বিজেপি ভাল কিছু করতে পেরেছে?

বরং একটা জায়গায় তাঁরা তৃণমূলকে ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে। মানুষের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে এক সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে আর এক সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃণার মনোভাব তৈরি করার ক্ষেত্রে বিজেপি অন্য সকলকে ছাপিয়ে গেছে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বেঁচে থাকার ঐতিহ্য এ দেশের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। বিজেপি তাকে ধ্বংস করছে। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এক সম্প্রদায়ের মানুষের মনে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কে ঘৃণা ও অসহিষ্ণু মানসিকতা তৈরি করছে। এটা একটা বিপজ্জনক প্রবণতা। প্রকৃত ধর্মীয় মূল্যবোধ কি এ জিনিস অনুমোদন করে? এটা কি কোনও ধরনের মূল্যবোধ?

আর এই কর্মযজ্ঞে প্রধান কান্ডারী হলেন বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী। সাধু সন্ন্যাসীরা নয়, তিনিই এখন ধর্ম প্রচারক। রাজ্যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীরাও এখন ধর্ম প্রচারক। তাঁরাই এখন ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছেন। ভেবে দেখেছেন কি, এরা কি সত্যিই ধর্ম প্রচারক? আপনারা কি মনে করেন প্রধানমন্ত্রী সত্যিই ভাষণে যা বলেন তা মেনে চলেন? আপনারা কি বিশ্বাস করেন যে, ধর্মেও যে সব আদর্শের কথা বলা রয়েছে,

সেগুলো তিনি মেনে চলেন? বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা প্রকৃতই ধর্মে বিশ্বাসী? এরা যে ভাবে সরকার চালাচ্ছেন, যে ভাবে দেশ চলছে, তার সবটাই ধর্মীয় শাসন? কোথাও অধর্ম নেই, কোথাও পাপ নেই? এটা হচ্ছে চরম ভণ্ডামি, মানুষকে প্রতারণা করা। এর পিছনে রয়েছে তাঁদের একটাই উদ্দেশ্য — ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি। এইজন্যই একের পর এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান, নানা ধর্মীয় মেলা। কুম্ভমেলায় কত মানুষ মারা গেল তার হিসাব নেই। পোস্টমর্টেমও হয়নি। এই মেলাটাও ছিল একটা ইনভেস্টমেন্ট। অর্থাৎ এই মেলার 'সাফল্য' প্রচার করে পরবর্তী ভোট বৈতরণী পার হওয়ার কৌশল। যাঁরা সৎভাবে ধর্ম মানেন, তাঁরা কি এদের এই সব কাজকর্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন? দেখা উচিত কি? এ সবই আসলে ধর্মের নামে ভণ্ডামি, প্রতারণা।

প্রতিটি নির্বাচনের আগে এদের নেতারা দলে দলে এই রাজ্যে আসেন। নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার ঐতিহ্য সম্পন্ন এই বাংলায় তাঁরা ঘৃণা ভাষণ দেন। মানুষের মধ্যে থাকা ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করেন। ইতিমধ্যেই বিজেপি নেতারা সোরগোল তুলেছেন যে, অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গায় নাকি এই রাজ্য ভরে গিয়েছে। অথচ ভোটার তালিকা সংশোধনের পরে কতজন অনুপ্রবেশকারী ও কতজন রোহিঙ্গা বাস্তবে পাওয়া গেল, সেই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর তারা দিচ্ছেন না। শুধু হুঙ্কার ছাড়ছেন, তাঁরা ক্ষমতায় এলে এদেরকে সীমানার ওপারে পাঠিয়ে দেবেন। তাতেই নাকি এই রাজ্যের বেকার সমস্যা থেকে শুরু করে সব সমস্যারই সমাধান করে ফেলবেন। তাই যদি সত্যি হতো, তাহলে তাদের দলের শাসনে রয়েছে যে রাজ্যগুলো সেখানে তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু হচ্ছে কি? হচ্ছে না যে, সেটা তাঁরাও জানেন। কিন্তু মানুষকে বিভ্রান্ত করা এবং ধর্মীয় জিগির তোলার জন্যই তাঁদের এই মিথ্যা ভাষণ। এই সহজ বিষয়টাও কি আমরা বুঝব না?

বিজেপি নেতারা যে এত সহজে মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃণা ভাষণ দিতে পারেন তার কারণ কী? একবারও ভেবে দেখেছেন কি? এদের অতীত ইতিহাসের দিকে চোখ রাখুন। দেখবেন, ধর্মীয় অন্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে যে নবজাগরণ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, এরা তার বিরোধী। এরা স্বাধীনতা আন্দোলনেরও বিরোধী। স্বাধীনতা আন্দোলনে যখন এদেশের যুবকরা প্রাণ দিচ্ছেন, তখন এদের নেতা গোলওয়ালকর বই লিখে প্রচার করেছিলেন যে, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলন নয়। সেই জন্য তাঁরা পরিকল্পিতভাবেই জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তাঁরা ব্রিটিশদের সহযোগিতা করেছিলেন, বিপ্লবীদেরকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। এদের নেতা সাভারকারই ১৯২৩ সালে তাঁর 'হিন্দুত্ব' বইতে প্রথম ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের দাবি তুলেছিলেন। তাই নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী এই বাংলার মাটিতে কি এদেরকে জায়গা দেওয়া যায়?

জাতীয় কংগ্রেস এদেশে স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বেশি সময় সরকারে থেকে একের পর এক জনবিরোধী নীতি নিয়ে চলেছে

সর্বভারতীয় স্তরে প্রধান বিরোধী দল হল জাতীয় কংগ্রেস। তারা এবার এককভাবেই রাজ্যের সব আসনে লড়ছে। ফলে প্রচারের আলো তাদের উপরও পড়বে, তারাও নিজেদেরকে তৃণমূল ও বিজেপির বিকল্প হিসেবে দেখাতে চাইবে। কিন্তু তারাও কি কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে দীর্ঘদিন সরকার চালায়নি? তাদের অতীত ইতিহাস কী? ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তারাই তো দীর্ঘদিন এই দেশ চালিয়েছে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কৃতিত্ব আত্মসাৎ করে কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে জাতীয় কংগ্রেস দীর্ঘদিন শাসন চালিয়ে এদেশের ধনিক শ্রেণির শোষণ শাসনকে পাকাপোক্ত করেছে। তাদের শাসনকালে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পুঁজিপতিরা অবাধে মুনাফা লুণ্ঠন করে ধনকুবের গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে গরীব-মধ্যবিত্তরা ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, বেকারির জ্বালায় অসহায় অবস্থায় দিন কাটিয়েছে। গণপ্রতিবাদ স্তব্ধ করতে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে একের পর এক কালা কানুন জারি করেছে। বিশ্বায়ন ও অর্থনীতির উদারীকরণের নীতি চালু করে পরিষেবার ক্ষেত্রগুলোকে মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে অবাধ মুনাফা লুণ্ঠনের সুযোগ করে দিয়েছে। তাদের অপশাসনে অতিষ্ঠ হয়েই দেশের মানুষ তাদের সরকারি ক্ষমতা থেকে অপসারিত করেছে।

৩৪ বছর রাজ্য শাসন করার অভিজ্ঞতা যাদের আছে সেই সিপিএম ফ্রন্টও বিকল্প হতে পারে না

খুব স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলের বিকল্প হিসাবে সিপিএম ফ্রন্টের কথা এসে পড়ে। কিন্তু তারা কি তৃণমূলের বিকল্প হতে পারে? তৃণমূল সরকার গত ১৫ বছর ধরে যে সব দুষ্কর্ম করছে, যার ফলে আপনি তার বিকল্প খুঁজছেন, তার কোনও একটি ক্ষেত্রেও কি তৃণমূল নতুন কিছু করছে? সিপিএম ফ্রন্টের দেখানো পথেই তো তৃণমূল এগিয়ে চলেছে। ২০১১ সালে মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল কেন? কারণ সিপিএম জমানায় সবকিছুই সিপিএম নেতা কর্মীদের কুক্ষিগত ছিল। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সিপিএম ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু বাস্তবে মানুষ তাদের শাসনে কী পেল? প্রকৃত বামপন্থাকে বিসর্জন দিয়ে সরকারি ক্ষমতায় দীর্ঘদিন টিকে থাকার উদগ্র বাসনায় পুঁজিপতিদের তোষণ করতে তাদেরই স্বার্থে অনুসৃত কংগ্রেসের নীতিগুলোকে কার্যকর করে গেছে। ক্ষমতায় থেকে তারা গণআন্দোলনগুলোকে শুধু নিরুৎসাহিত করেনি, পুলিশ ও দলীয় কর্মীদের দিয়ে লাঠি-গুলি চালিয়ে খুন জখম করে নানা ভাবে দমন করেছে। নদীয়াতে তারা আন্দোলনকারী কৃষকদের হত্যা করেছে, চটকল শ্রমিকদের হত্যা করেছে, আন্দোলন করছে বলে কলকাতা বন্দরের শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করেছে। আমাদের দলের ১৫৯ জন নেতা কর্মীকে খুন করেছে। এই সরকারই বাসভাড়া ও

মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী যে গণআন্দোলন আরও বেশ কয়েকটি বামপন্থী শক্তিকে নিয়ে পরিচালত হয়েছিল— সেই আন্দোলনে গুলি চালিয়ে মাধাই হালদারকে শহিদ করেছে, অসংখ্য আন্দোলনকারীকে গুলিবিদ্ধ করেছে। পুরুলিয়ায় শোভারাম মোদক, হাবুল রজককে হত্যা করেছে। বহু মানুষকে পঙ্গু করে দিয়েছে। সিঙ্গুরে কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে চাষিকে পিটিয়েছে। রাজকুমার ভুল, তাপসী মালিককে হত্যা করেছে। নন্দীগ্রামে গুলি চালিয়ে গুণ্ডা দিয়ে নারী ধর্ষণ করে মানুষের উপর নারকীয় অত্যাচার করেছে। মরিচঝাঁপির ঘটনা কি সকলেই ভুলে গিয়েছেন মনে হয়?

স্কুলের পিয়ন থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটির উপাচার্য — সবকিছুই তারা কন্ট্রোল করত। শিক্ষায় 'অনিলায়ন' কথাটা তো শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের কারণেই এসেছিল। তারাই তখন থানা কন্ট্রোল করত, পুলিশ প্রশাসনের উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েম করেছিল। প্রমোটারি, কন্ট্রাক্টরি, সিন্ডিকেট রাজত্ব — এই সব তো এই রাজ্যে সিপিএমই এনেছিল। এ রাজ্যে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি বলে একটা কথা চালু হল, যা সিপিএম শাসনের আগে কেউ জানত না। রাজনীতি মানেই পেতে হবে। পঞ্চায়েত দেবে, কর্পোরেশন দেবে, সরকার দেবে। ফলে সরকারকে সমর্থন করো। এই ভাবে পাইয়ে দেওয়ার সুবিধাবাদী রাজনীতির কানাগলিতে আন্দোলনকে ডুবিয়ে দিয়েছে। ৩৪ বছর তারা এ ভাবেই সরকার চালিয়েছে। আর দুর্নীতি? সিপিএম আমলে দুর্নীতি হয়নি? হ্যাঁ, একটা পার্থক্য আছে। সিপিএম সংগঠনের একটা বাঁধুনি ছিল। ফলে আজকের মতো সব কিছু প্রকাশ্যে আসেনি। একথা ঠিক, তৃণমূল শাসনে দুর্নীতি বহু মাত্রায় তাদেরকে ছাপিয়ে গেছে। তাদের ৩৪ বছরের অপশাসনে অতিষ্ঠ মানুষ তাদের সরকারি ক্ষমতা থেকে শুধু অপসারিত করেনি, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

আর একটা বিষয় ভেবে দেখতে বলব। সিপিএম নিজেদের বামপন্থী, মার্ক্সবাদী বলেই পরিচয় দেয়। বহু মানুষ বামপন্থার প্রতি, বিপ্লবের প্রতি আবেগ থেকেই এই দলে যুক্ত হয়ে আছেন। কিন্তু বাস্তবে তারা কি বামপন্থার আদর্শ নিয়ে চলছে? আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা সিপিএম নেতাদের কাছে বারবার আহ্বান রেখেছি, আপনারা জনগণের স্বার্থে প্রকৃত গণআন্দোলনে আসুন। আমরা বলেছিলাম আপনারা তো মার্ক্সবাদের কথা বলেন। মহান মার্ক্সবাদী নেতা লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী আপনারা জনগণের কাছে ভুল স্বীকার করুন। জনগণ আপনাদের আবার মাথায় তুলে নেবে। কিন্তু তাতে তাঁরা সাড়া দেননি। বরং যে কংগ্রেস এ দেশে সবচেয়ে বেশিদিন রাজত্ব করে জনসাধারণের উপর শোষণ নির্যাতন চালিয়েছে, যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কত প্রাণের বিনিময়ে লড়াই করেছে বামপন্থীরা, যে কংগ্রেসকে একসময় সিপিএম আধা ফ্যাসিস্টও বলেছে, যে কংগ্রেস জরুরি অবস্থা জারি করেছিল, বাবরি মসজিদের তালা খুলে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়েছে এবং যে কংগ্রেস বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূল কারিগর হিসাবে কাজ করেছে, তারই সঙ্গে সারাদেশে সিপিএম জোট করেছে। এ রাজ্যে গতবারও জোট করেছে। এবার কংগ্রেস চায়নি বলে

এ রাজ্যে তাদের সাথে জোট হয়নি। সে তো আলাদা প্রশ্ন। কিন্তু এ কি যথার্থ বামপন্থা?

শুধু তাই নয়, তারা আই এস এফ-এর সাথে গত বছরের মতো এ বছরও জোট করেছেন। আই এস এফ কি সেক্যুলার? এমনকি মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ তৈরির হোতা হুমায়ুন কবীরের সাথে তাদের রাজ্য সম্পাদক গোপন বৈঠক করেছেন। আন্দোলনের পথ ছেড়ে দিয়ে তাঁরা এখন হিসাব কষতে ব্যস্ত যে, কার সাথে জোট করলে কিছু সিট পাওয়া যায়, তাতে নীতি আদর্শ থাকল কি গেল, তাতে কিছু যায় আসে না। এটা তো বেশি দিন আগের কথা নয়, ২০১৬ সালের নির্বাচনের সময় থেকেই তৃণমূলকে হারানোর জন্য তাঁরা তাঁদের কর্মীদেরকে 'আগে রাম, পরে বাম' মন্ত্র জপতে শিখিয়েছিলেন। বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক দলকে এই রাজ্যে জায়গা করে নিতে সাহায্য করেছিলেন। একথা তাঁদেরই এক বর্ষিয়াণ নেতা আর এক নেতার সামনে সরাসরি বলেছেন তাই সিপিএমের সৎ, বামপন্থায় বিশ্বাসী, আদর্শবাদী কর্মী সমর্থকদের ভেবে দেখতে বলব, তাদের নেতৃত্ব তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

কেন এই পার্টিগুলো সকলেই সরকারে গিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে জনস্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে

এই প্রশ্নটি গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। আমরা যদি আমাদের দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকি, তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর পাব না। এ কথা আজ আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে আমাদের এই দেশটা একটা অখণ্ড দেশ নয়, আমাদের সমাজটা শ্রেণি বিভক্ত সমাজ। এর একদিকে আছে কোটি কোটি শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী,সাধারণ মানুষ। আর একদিকে আছে মুষ্টিমেয় কর্পোরেট সংস্থা বা একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী। এই দুই পক্ষের স্বার্থ এক নয় —সম্পূর্ণ বিপরীত। যে নীতি বা দল পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে, সেই দল বা নীতি আপামর জনগণের স্বার্থ সিদ্ধি করতে পারে না। এটা বুঝতে পারলে আমরা সহজেই দেখতে পাব, এই দলগুলো সরকারে গিয়ে কার স্বার্থ রক্ষা করে। এরা সকলেই পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থই রক্ষা করে। তাদের স্বার্থেই নীতি নির্ধারণ করে। সেজন্যই পুঁজিপতিরা এই দলগুলোকে টাকা দেয়। ইলেকশন বন্ডের বিষয়টা প্রকাশ্যে আসার পরে সাধারণ মানুষের কাছে ঘটনাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই এই দলগুলো যারা যখন ক্ষমতায় যায়, এদের স্বার্থেই কাজ করে। কিন্তু এরা আড়ালেই থেকে যায়। মানুষ দেখে সরকারকে আর সরকারি দলের নেতা মন্ত্রীদের। ভাবে এদের পাল্টালেই বুঝি তাদের জীবনের দুর্দশা দূর হবে। কিন্তু এই দলগুলোর মধ্যে যারাই সরকারি ক্ষমতায় আসুক বাস্তবে অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় না। তাই মহান লেনিন বলেছিলেন, ''বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আড়াল করার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আবরণ এবং এটা একবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে তখন নির্বাচনের মাধ্যমে কোনও ব্যক্তির, কোনও প্রতিষ্ঠানের বা কোনও পার্টির পরিবর্তনের দ্বারা এই

বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে পাল্টানো সম্ভব নয়। ... কয়েক বছর অন্তর শোষক শ্রেণির হয়ে কারা সরকারে বসবে এবং জনগণকে শোষণ অত্যাচার করবে ইলেকশনের দ্বারা এটাই নির্ধারিত হয়।"(দি স্টেট অ্যান্ড রেভলিউশন)।

সাধারণ মানুষের কাছে প্রকৃত বিকল্প কী

গত '৫২ সাল থেকে এ দেশের মানুষ ভোট দিয়ে আসছে। ভোট দিয়ে এই দলগুলোর কাউকে না কাউকে জিতিয়ে আসছে। কিন্তু অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। ভোট দিয়ে সরকার পরিবর্তন করলেই যদি অবস্থার পরিবর্তন হত,তাহলে এতদিনে তার ফল আমরা পেতাম। কিন্তু তা হয়নি। কারণ ভোট দিয়ে সরকার পাল্টানো যায়, শোষণমূলক ব্যবস্থাকে পাল্টানো যায় না। এই ব্যবস্থাকে পাল্টাতে হলে লড়াই চাই, আন্দোলন চাই। এটা তত্ত্বকথা বলে এড়িয়ে গেলে জনসাধারণেরই ক্ষতি। ইতিহাসে আমরা দেখি মানুষ যতটুকু অধিকার অর্জন করেছে, তার জন্য তাঁকে লড়তে হয়েছে। লড়াই ছাড়া, আন্দোলন ছাড়া কেউ কোনও অধিকার দিয়ে দেয় না,বিশেষ করে যারা বর্তমান ব্যবস্থার সুফল ভোগ করছে তারা কখনোই বিনা লড়াইয়ে এক কপর্দকও আপনাকে দেবে না। তাই লড়াই আন্দোলনই একমাত্র বিকল্প। যারা লড়াই আন্দোলন গড়ে তুলছে, আপনার অধিকার আদায় করার জন্য জীবনপাত করছে বুঝবেন তাঁরাই আপনার বন্ধু। যে দল লড়াই আন্দোলনে আপনার সাথী, সেই দলই তো আপনার ভোট পাওয়ার প্রকৃত দাবিদার। কারণ, তাদের শক্তিবৃদ্ধি জনগণের সংগ্রামের শক্তিবৃদ্ধি। তাদের প্রতিনিধিকে বিধানসভায় পাঠাতে পারলেই একমাত্র আপনার কণ্ঠস্বর বিধানসভার ভিতরে পৌঁছাবে। তাই কোন দলের গ্ল্যামার বেশি, কার টাকা বেশি, লোক বেশি, প্রচার বেশি — এ সব বিচার অর্থহীন। কোন দলকে দিয়ে কোন দলকে হারাব— এই চিন্তা নয়, আজ সাধারণ মানুষের প্রয়োজন কি করলে সত্যিই নিজেরা জিতবেন, তা দেখা। মানুষের জয় আনতে পারে সংগ্রামী বামপন্থা। এইজন্যই নির্বাচনে সংগ্রামী বামপন্থী রাজনীতিকে চিনে নিতে হবে। এটাই হল দল বিচারের প্রকৃত মাপকাঠি।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) আপনার লড়াইয়ের সাথী
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন

মালিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাকারী ভোট সর্বস্ব দলগুলোর একেবারে বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) নির্বাচনে লড়ছে জনস্বার্থে গণআন্দোলন গড়ে তোলার শক্তিকে জেতানোর আহ্বান নিয়ে। গণআন্দোলনেরই পরিপূরক কর্মসূচি হিসাবে নির্বাচনী লড়াইকে দেখার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লড়ছে এই দল। কেন মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই দল নির্বাচনী লড়াইকে নিছক সরকারি মসনদে এক দলের বদলে আর এক দলকে বসিয়ে দেওয়ার দৃষ্টি থেকে না

দেখে, গণআন্দোলনের পরিপূরক লড়াইয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার কথা এত জোর দিয়ে বলে? আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা দেখায়, ভোটে জেতে দল, মানুষ জেতে একটার পর একটা গণআন্দোলনের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। তিনি বলেছিলেন, ''ভোটের মারফত হাজারবার সরকার পাল্টে বা আক্ষরিক অর্থে আইন কানুন সংশোধন করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। এই মুক্তি অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সঠিক বিপ্লবী কায়দায় পরিচালনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে জনসাধারণের অমোঘ সংঘশক্তি গড়ে তোলা এবং বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির দলের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা।''

এই শিক্ষার ভিত্তিতেই আমাদের দল তার জন্মলগ্ন থেকেই সাধারণ মানুষের লড়াই আন্দোলনের পাশে থেকেছে। মানুষকে সংগঠিত করে বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। বামপন্থার প্রকৃত নীতির ভিত্তিতে যেমন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে আমাদের দল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তেমনি নীতির ক্ষেত্রে আপস রফা না করে একক শক্তিতেও আন্দোলন গড়ে তুলেছে। অতীতের আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই আমাদের দল তৃণমূল সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। লড়াই করতে গিয়ে আমাদের অসংখ্য কর্মী আহত হয়েছেন। দু'জন যুবকর্মীর চোখ চলে গিয়েছে। এই লড়াইয়ের জন্যই দক্ষিণ ২৪ পরগনার নেতা কমরেড সুধাংশু জানাকে হত্যা করেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতকারীরা। সাম্প্রতিক কালে আরজিকর মেডিকেল কলেজে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসকের হত্যা ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে, প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সারা রাজ্য ব্যাপী লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলেছে। কখনও দলীয় প্ল্যাটফর্ম থেকে, আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গণকমিটি গড়ে তুলে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে এই দলের কর্মীরাই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

এছাড়াও ব্লকে ব্লকে চাষিদের নিয়ে সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে শুরু করে বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার চালুর বিরুদ্ধে এবং বিদ্যুতের মাশুল কমানোর দাবিতে আন্দোলন, আশাকর্মী সহ স্কিম ওয়ার্কারদের আন্দোলন, জুট শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক, বাইক ট্যাক্সিচালক, চা শ্রমিকদের সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তুলছে। একই সাথে বিজেপি সরকারের সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি, তৃণমূল সরকারের রাজ্য শিক্ষানীতি, পরীক্ষার সেমিস্টার পদ্ধতি চালু ও ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলছে। রাজ্য জুড়ে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন রুখতে পদক্ষেপের দাবিতে, মদ সহ মাদকের প্রসার বন্ধের দাবিতেও এই দল লড়ছে, কখনও দলীয় পতাকা নিয়ে, কখনও গণসংগঠন ও সামাজিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে চলছে এই আন্দোলন। মানুষ জানে প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার আন্দোলন সহ বহু গৌরবময় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই দল আজ গণআন্দোলনের একমাত্র শক্তি হিসেবে মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে।

১৯৫৯ সালে কংগ্রেসী শাসনের সময় খাদ্য আন্দোলনের শহিদ স্মরণে আইন অমান্য আন্দোলনে ১৯৯০ সালে এই দলের কিশোর কর্মী শহিদ মাধাই হালদারের রক্তধারা, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের বাস ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের শহিদ আবুল রজক ও শোভারাম মোদকের রক্তধারার সাথে জড়িয়ে আছে সংগ্রামের সেই ইতিহাস। সুন্দরবন এলাকার তেভাগা আন্দোলন ও পরবর্তীকালে গরিব মানুষের আন্দোলনের নেতা আমির আলী হালদার, মোকাররম খাঁ, সুষেণ মাইতি, অশোক হালদার সহ শতাধিক শহিদ এই দলের সংগ্রামী লাল পতাকা বুকে জড়িয়ে রক্ত ঢেলে গেছেন কৃষকের অধিকার, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার শপথে।

তাই গণআন্দোলন এবং সংগ্রামী বামপন্থার প্রতিনিধিত্ব করছে এই দল। গণ আন্দোলনের শক্তিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আমরা রাজ্যে ২৩০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। গণআন্দোলনের পরীক্ষিত সৈনিকরাই আমাদের দলের প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হয়েছেন। আপামর জনসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন— সাধারণ মানুষের লড়াইকে শক্তিশালী করতে সমস্ত দিক থেকে সাহায্য করুন এবং সর্বত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন।

অভয়ার ন্যায় বিচার, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি, বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি প্রতিরোধ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক-কৃষক বিরোধী নীতি ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল সহ অন্যান্য দাবিতে লেনিন স্মরণ দিবসে কলকাতার রাজপথে মহামিছিল। উপস্থিত রয়েছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। ২১ জানুয়ারি ২০২৫

তৃণমূল কংগ্রেসের ‘সোনার বাংলা’

সরকারি স্কুল বেহাল

রাজ্যের ৬৬ হাজার ৭৪৪টি প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে ১১ হাজার ৫১৫টি প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ৩০ জনেরও কম। ৩ হাজার ৬৬৯টি স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৫ জনের কম। ৭৪৭ স্কুলে নেই কোনও ছাত্র। ৫ হাজার ১৪৯টি স্কুল চলছে একজন শিক্ষক দিয়ে। (সূত্র ঃ সমগ্র শিক্ষা মিশন, ২০২৪-২৫) উচ্চ প্রাথমিকে মোট ৬ হাজার ৪২৬টি স্কুলের মধ্যে ৮৯১টিতে একজন শিক্ষক, ১ হাজার ৪৭৫টি স্কুলে ৩০ জনের কম ছাত্র, ৭২০টিতে ১৫ জনের কম ছাত্র এবং ২৫৯টি স্কুলে কোনও ছাত্র নেই। (সূত্র ঃ সমগ্র শিক্ষা মিশন, ২০২৪-২৫)

মিড ডে মিলের ৮৩ শতাংশ টাকা খরচ হয়নি

২০২৩-২৬ এই তিন বছরে মিড ডে মিল প্রকল্পে রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছিল ৬৩৪৯ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। খরচ হয়েছে ১০৭৭ কোটি ১ লক্ষ টাকা। বরাদ্দ হলেও খরচই হয়নি ৮৩.৪ শতাংশ টাকা। ২০২৬-২৭-এ মিড ডে মিল প্রকল্পে তৃণমূল সরকার বরাদ্দ নামিয়ে এনেছে ১১৫০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকায়। ২০২৩-২৪-এর বরাদ্দের অর্ধেকেরও কম। গত বাজেট বরাদ্দের থেকে কম ৫০০ কোটি টাকা। সূত্র ঃ তৃণমূল সরকারের বিধানসভায় পেশ করা রিপোর্ট

বেড়েছে ড্রপ আউট

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলছুট ৪২ শতাংশ। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ভর্তি হয়েছিল ৪০ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৬৬ জন ছাত্রছাত্রী। বছর শেষে রাজ্য সরকার জানিয়েছে, মিড ডে মিল দেওয়া হয়েছে ২৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ২৩২ জনকে। মাধ্যমিক স্তরে ড্রপ আউটে পশ্চিমবঙ্গ সর্বোচ্চ। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মধ্যে ২০ শতাংশ ছাত্র, ১৭.৮ শতাংশ ছাত্রী স্কুল ছেড়েছে। রাজ্যে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী মেয়েদের ৪৯ শতাংশই লেখাপড়া ছেড়ে রোজগারে মন দিতে বাধ্য হয়েছে। (এডুকেশনওয়ার্ল্ড.ইন ১৫.০১.২০২৫, দ্য ওয়ার ২৩.০৩.২০২৫, দ্য ইন্ডিয়া ফোরাম ১৫.০১.২০২৬)

সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার বিলোপ ঘটছে

২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল শুধু নয়, সরকার দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে নিয়োগের পরীক্ষাটাই নিচ্ছে না। লোকবলের অভাবে মিড ডে মিল, সরকারের

নানা পোর্টালে অসংখ্য আপলোডের চাপ, নির্বাচনের নানাবিধ কাজ, বিএলও হওয়া থেকে গ্রামের পশুপাখি সেন্সাস ইত্যাদি সব দায়িত্ব সামলে শিক্ষকদের পক্ষে শিক্ষাদানের সময়টাই মেলা দুষ্কর। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তরে ড্রপ আউট নেই বলে সরকারের দাবি হলেও ভোটের আগে মিড ডে মিলে বাড়তি ডিম ও ফল বরাদ্দ করতে গিয়ে রাজ্য সরকারই জানিয়েছে বহু ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে আসে না বলে তাদের জন্য বরাদ্দ খরচই হয় না।

উচ্চশিক্ষায় ছাত্র কমছে

এই রাজ্যে উচ্চশিক্ষায় ছাত্রছাত্রী কমেছে প্রায় ৭ লক্ষ। বাজেট নথিতে সরকার জানিয়েছে যে, ২০২৪-২৫-এ উচ্চশিক্ষায় ছাত্রছাত্রী ছিল ২৭ লক্ষের বেশি। ২০২৫-২৬-এ তা হয়েছে ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার। পাশফেল তুলে দেওয়া সহ ভ্রান্ত শিক্ষানীতি এবং চার বছরের ডিগ্রি কোর্সের ধাক্কায় কলেজগুলোতে ছাত্র ভর্তি মারাত্মক ভাবে কমে গেছে। রাজ্যে সরকার পোষিত ৩১টি এবং অন্যান্য মিলিয়ে ৪২টি বিশ্ববিদ্যালয় থাকার গর্ব করে সরকার। কিন্তু সরকার পোষিত এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থা শোচনীয়। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়িটাও নেই। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ হয়নি। একটা দুটো বিষয়ে অতিথি শিক্ষক দিয়ে ক্লাস চালিয়ে কোনও রকমে অস্তিত্ব রক্ষা করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি।

এগিয়ে শিশু-মৃত্যুতে

২০১০ সালে ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে ছিল ১৫তম। ২০২৫-এ তা হয়েছে ১৯তম, অর্থাৎ শিশুমৃত্যুর হার কমার বদলে বেড়েছে। তথ্যঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস অব দ্য রেজিস্ট্রার জেনারেল অব ইন্ডিয়া

কর্মসংস্থানের বেহাল দশা, বেকারি বাড়ছে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবি রাজ্যে বেকার মাত্র ২.১ শতাংশ। যদিও লেবার ফোর্স পার্টিশিপেশন রেট দেখাচ্ছে এই রাজ্যে ২০২৫-এর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর এই তিন মাসে কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক কোনও কাজ পায়নি। ২০২৫-২৬-এর আর্থিক সমীক্ষা দেখিয়েছে— পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্বের হার ২০২৫-এর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে ছিল ৬.১ শতাংশ, সর্বভারতীয় গড় যেখানে ৫.২ শতাংশ। (সংসদে পেশ করা ২০২৫-২৬-এর আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট)

পশ্চিবঙ্গের ৪৪ শতাংশ মহিলা খাতায়কলমে কর্মরত হলেও তার বেশির ভাগই (৭৫ শতাংশ) স্বনিযুক্ত। স্বনিযুক্তিতে যারা যুক্ত বাস্তবে তাদের নির্দিষ্ট কোনও আয় নেই। অনেকেরই আয় একেবারে নামমাত্র। নিয়মিত বেতন পাওয়া মহিলাদের সংখ্যা কমে ২০২৩-২৪-এ দাঁড়িয়েছে মাত্র ৯ শতাংশ। টেলারিং, জরি, পাট, বিড়ি, তাঁতের কাজ সর্বত্রই মহিলাদের মজুরি ঘণ্টায় ১০ থেকে ২৫ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে, মফস্বলে শহরেও

এখন বেসরকারি সংস্থার থেকে ঋণ নিয়ে শোধ করতে না পেরে মহিলাদের ঘরবাড়ি ছাড়ার ঘটনা ঘটছে। (স্বাতী ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮. ১২. ২০২৫)

চা শ্রমিকরা রয়েছেন সেই তিমিরে

২০১৫ সালে চা বাগান শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চালু করার জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। তারপর থেকে এক দশক অতিক্রান্ত। রাজ্যের লক্ষাধিক চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতে পারেনি সরকার।

২০২১ সালে আলিপুরদুয়ারে সরকারের ন্যূনতম মজুরি অ্যাডভাইজারি কমিটি শেষ বৈঠকে বসেছিল। সেখানে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি নির্ধারিত হয়েছিল ৬৬০ টাকা। সেই মজুরি এখনও চালু হয়নি। এখন দৈনিক মজুরি মাত্র ২৫০ টাকা, সেই টুকুও সব শ্রমিক পায় না। চা-বাগানে স্থায়ী শ্রমিক কথাটাই আজ প্রায় নেই। পিএফ, ইএসআই, স্বাস্থ্য পরিষেবা সবই অনিশ্চিত। মালিকরা চা বাগান চালানোর বদলে ফড়েদের মাধ্যমে চাষিদের কাছ থেকে পাতা কিনে তা ফ্যাক্টরিতে প্রসেসিংয়ের দিকেই ঝুঁকছে। চাষিরা কাঁচা পাতা বিক্রি করার সময় ফড়েরা তার দাম প্রতিদিন কমায়। বহু ক্ষেত্রে চাষিদের চা পাতা তোলার খরচও এই দামে ওঠে না।

কৃষকের আয়ে রাজ্য পিছিয়ে

পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজীবী পরিবারগুলির গড় মাসিক আয় ১১ হাজার ৪৫৬ টাকা। এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে ২৪তম স্থানে রয়েছে। তথ্য ঃ নাবার্ড সমীক্ষা

নাবালিকা বিয়েতে এগিয়ে

পাঁচ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের আগে ছিল বিহার। এখন পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে। রাজ্যে গত দু-তিন বছরে ৪১.৬ শতাংশ নাবালিকার বিয়ে হয়েছে। বিহারে তা ৪০.৮ শতাংশ।

বেড়েছে মাতৃত্বকালীন মৃত্যু

মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার রাজ্যে গত দেড় দশকে বেড়েছে। পুষ্টির অভাব, অল্প বয়সে বিয়ে, রক্তাল্পতা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে সরকারি অবহেলা প্রভৃতি প্রসূতি মৃত্যুর কারণ। ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের রক্তাল্পতা বেড়ে চলেছে ভয়ঙ্কর হারে। ৭১.৪ শতাংশে পৌঁছেছে ২০২৩ সালে। (রিসার্চ গেট, ফেব্রুয়ারি ২০২৫)

মদ বিক্রি বেড়েছে ৮৩২ শতাংশ

২০১১-য় মদ বিক্রি করে বামফ্রন্ট সরকারের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৪১৮ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা।গত দেড় দশকে রাজ্যে মদ বিক্রির পরিমাণ পৌঁছেছে ২২ হাজার ৫৫০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকায়। বৃদ্ধি ৮৩২.২৩ শতাংশ।

স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু খরচে রাজ্য ২৬তম

স্বাস্থ্যখাতে জাতীয় স্তরে মাথাপিছু সরকারের খরচ ৩১৬৯ টাকা। পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু ২৪৫৪ টাকা খরচ করছে সরকার। দেশের ৩১টি রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ২৬তম।

স্বাস্থ্য পরিষেবা, নাকি লাভজনক ব্যবসা

একদিকে ঝাঁ-চকচকে 'সুপার স্পেশালিটি' হাসপাতালের বিল্ডিং অন্য দিকে 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ডে কত লোকের চিকিৎসা হল তার হিসাব। অথচ, এই সমস্ত তথাকথিত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে কোনও একজন স্পেশালিস্ট দূরের কথা, বেশিরভাগ পোস্টে ডাক্তারই নেই। নেই নার্স, টেকিনিশিয়ান বা অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী। স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে আছে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অধিকাংশটাই। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভেজাল ওষুধ, নিম্নমানের ওষুধের সমস্যা। ভেজাল স্যালাইনে একাধিক প্রসূতির মৃত্যু ঘটেছে। ভেজাল ওষুধের কারবারিরা অন্য রাজ্যে কালো তালিকায় থাকলেও এই রাজ্যে বিপুল সরকারি অর্ডার পেয়ে গেছে। আরজিকর হাসপাতালের খুন-ধর্ষণের ঘটনার পর জানা গেছে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যকে বাজি রেখে মৃতদেহ পাচার, অঙ্গ পাচার, বিষাক্ত ওষুধের কারবার, নিম্নমানের যন্ত্রপাতি থেকে সমস্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে জালিয়াতির এক ভয়ঙ্কর চক্রের কথা। রাজ্যে ৯৯ শতাংশ প্রসব হাসপাতালে হওয়া এবং প্রসূতি মায়ের মৃত্যুর হার কমার কৃতিত্বের সিংহভাগ দাবিদার রাজ্যের আশাকর্মী, পৌরস্বাস্থ্যকর্মীদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতিটুকু দিতেও সরকার নারাজ। মাথাপিছু ধার ৭৭ হাজার ১৭৭ টাকা ২০১১ সালে। তৃণমূল আসার আগে রাজ্যের মোট ঋণ ছিল ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৯১৯.৯ কোটি টাকা। এখন রাজ্যের ধার পৌঁছেছে ৭,৭১,৬৭০ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা (২০২৬-এর ৩১ মার্চ ধরে)। অর্থাৎ মাথাপিছু ধার ৭৭ হাজার ১৭৭ টাকা।

আশাকর্মীদের বেতন নামমাত্র

আশাকর্মীদের বেশ কিছু দাবি আদায় হলেও বহু দাবি অপূরিত। মাতৃত্বকালীন ছুটি, ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা ভাতা, ভাতা নিয়মিত দেওয়া সহ বিভিন্ন দাবিতে লাগাতার কর্মবিরতি চালিয়েছেন আশাকর্মীরা। মাত্র ১ হাজার টাকা ভাতাবৃদ্ধি, মাতৃত্বকালীন ছুটি গ্রাহ্য হলেও গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা টিকিয়ে রাখার কারিগর আশাকর্মীরা বঞ্চিতই রয়েছেন।

শিল্প বন্ধ

রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে ২০২৪-২৫-এ পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ হয়েছে ১৫৪৮টি ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প, কাজ গেছে ৮৮৫৬ জনের (দ্য ওয়ার ১৯.০৩.২০২৫)।

দারিদ্র কমছে কোথায়

'উন্নয়নের পাঁচালি'তে রাজ্য সরকারের দাবি, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গড় উৎপাদন

(জিএসডিপি) বেড়েছে ৪ গুণের বেশি। মাথাপিছু আয়ও ২০১১-১২ থেকে তিন গুণ বেড়ে হয়েছে প্রায় ১.৬৩ লক্ষ টাকা। দারিদ্রসীমার বাইরে এসেছেন ১.৭২ কোটি মানুষ। কিন্তু দারিদ্র কমা, মাথাপিছু আয় বাড়ার কোনও সুফল কি সাধারণ বঙ্গবাসী চোখে দেখেছেন? পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত শহরের দরিদ্র এলাকায় পাঁচ বছরের নিচে ৩২ শতাংশ শিশু অপুষ্টি, বয়সের তুলনায় কম বৃদ্ধি, কম ওজনের সমস্যায় ভুগছে। শিশুদের মধ্যে বাড়ছে শ্বাসকষ্টজনিত নানা সমস্যা। যা অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে ঘটছে বলে গবেষকরা জানাচ্ছেন। (ইউ এন ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে রিপোর্টের ভিত্তিতে সমীক্ষা, এমডিপিআই ২৮.০২.২০২৫)

দুর্নীতির বাড়বাড়ন্ত

পশ্চিমবঙ্গে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতির কারণে স্কুলশিক্ষায় ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। দুর্নীতির দায়ে তৃণমূলের একাধিক নেতা, মন্ত্রী, বোর্ড সভাপতি, স্কুল সার্ভিস কমিশনের কর্তা গ্রেপ্তার হয়েছেন। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এবং শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ২৬ হাজার শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীর চাকরি বাতিল হয়েছে।

চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, নারদ কেলেঙ্কারি ইত্যাদি কোনওটির তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা সিবিআই-ইডি করেনি। বরং দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতারা বিজেপিতে নাম লিখিয়ে তদন্ত থেকে ছাড় পেয়ে গেছেন।

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে দলের ডাকে মহিলা মিছিল। ৫ জুলাই, ২০২৫

বিজেপির ‘রাম রাজত্ব’

স্থায়ী কাজই নেই

দেশে শ্রমজীবী মানুষের ৯০ শতাংশই অসংগঠিত বা ‘ইনফরমাল’ কাজ করে। এর মধ্যে ৫৭ শতাংশের বেশি স্বনিযুক্ত, ১৮ শতাংশ বেতনহীন শ্রমিক হিসাবে পারিবারিক কোনও উৎপাদনে কাজ করেন। কারখানা শ্রমিকের ৪২ শতাংশই চুক্তি শ্রমিক। এ দিকে গিগ শ্রমিক অর্থাৎ নানা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের হয়ে কোনও নির্দিষ্ট চুক্তিতে অথবা শ্রমিকের স্বীকৃতি ছাড়াই কর্মরত মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এমনকি সেনাবাহিনীতেও স্থায়ী নিয়োগ তুলে দিয়ে, ‘অগ্নিবীর’ নামক গালভরা নাম দিয়ে মাত্র ৪ বছরের মেয়াদের চাকরির ব্যবস্থা করেছে মোদি সরকার। পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যার সঠিক হিসাব না থাকলেও তা ১৫ থেকে ২০ কোটির কম নয়। (ইন্ডিয়াডাটাম্যাপ.কম,০২.০৯.২০২৫)

দেশে বেকারত্বের হারে সবচেয়ে এগিয়ে শহরাঞ্চলের ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী যুব সমাজ। সামগ্রিক বেকারত্বের হারের থেকে তা অনেক বেশি। দেশে যখন ৬ বা ৭ শতাংশ বেকার দেখানো হয় সেই সময়ে শহরে যুব বয়সীদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৬ শতাংশের বেশি। পশ্চিমবঙ্গে তা ১৭.৯ শতাংশ। (ইন্ডিয়া টুডে, ১৭.০৬.২০২৫)

শিল্প বন্ধ

সারা দেশে ২ লক্ষ ৪০ হাজারের বেশি কারখানা গত পাঁচ বছরে বন্ধ হয়েছে। পাঁচ বছরে ‘এমএসএমই’ বা মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প বন্ধ হয়েছে ৭৫ হাজার। শুধু গত বছরই বন্ধ হয়েছে ৩৫ হাজার। রাজ্যসভায় সরকার জানিয়েছে ২০২৪-২৫-এ মহারাষ্ট্রে বন্ধ হয়েছে ৮৪৭২টি কারখানা, তামিলনাড়ুতে ৪৪১২, গুজরাটে ৩১৪৮, রাজস্থানে ২৯৮৯, কর্ণাটকে ২০১০ টি, পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ ১৫৪৮টি এমএসএমই শিল্প, কাজ গেছে ৮৮৫৬ জনের। (দ্য ওয়ার ১৯.০৩.২০২৫)

বিপুল ছাঁটাই

লোকসভায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পমন্ত্রী জিতনরাম মাঝি জানিয়েছেন ২০২২-২৩-এ মহারাষ্ট্রে এমএসএমই শিল্পে কাজ গেছে ৫৪,০৫৩ জন শ্রমিকের, তামিলনাড়ুতে কাজ গেছে ৪৩,৩২৪ জনের, উত্তরপ্রদেশে কাজ গেছে ৩৩২৩০, গুজরাটে কাজ গেছে ২২৩৪৫ জনের। (দ্য মিন্ট ২৫ জুলাই ২০২৪) গত ১০ বছরে আরও ৫০ হাজার কারখানা বন্ধের ফলে ৩ লক্ষ শ্রমিকের কাজ হারানোর কথা সংসদে স্বীকার করেছেন মন্ত্রী। (দ্য ওয়ার ১৯.০৩.২০২৫)

ন্যানো কারখানা ও শিল্পায়ন

বিজেপি এবং সিপিএম বলে সিঙ্গুরে টাটাদের কারখানা হলেই নাকি শিল্প গড়গড় করে পশ্চিমবঙ্গে লাইন দিত! অথচ, গুজরাটের সানন্দ-তে নরেন্দ্র মোদির সরকার ১ লক্ষ টাকা দামের ন্যানো গাড়ি পিছু প্রায় ৬০ হাজার টাকা করে ভর্তুকি দিলেও ন্যানো গাড়ি উৎপাদন বহু বছর আগেই বন্ধ হয়ে গেছে! সেখানকার জমিদাতা কৃষকরা টাটার কারখানায় প্রথমে কিছু অস্থায়ী চাকরি পেলেও এক বছর পর তা চলে গেছে। সরকার জমির দাম দিয়েছিল ৯০০ টাকা বর্গ মিটার। পরে সেই জমি গুজরাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন বিক্রি করেছে কোটি কোটি টাকা দরে। (এনডি টিভি ৩.১২.২০১৭, দ্য টেলিগ্রাফ ২.৬.২০১০, ট্রিনিটি কলেজ স্টুডেন্ট আরবান রিসার্চ ১৫.২.২০১০)

ডবল ইঞ্জিন রাজ্যেও স্কুলশিক্ষার সর্বনাশ

বিজেপি রাজত্বে উত্তরপ্রদেশে স্কুল 'ক্লোজার অ্যান্ড মার্জার' করছে ২৭ হাজার, রাজস্থানে ১৯ হাজার ৫০০, মহারাষ্ট্রে ১৫ হাজার, গুজরাটে ৭ হাজার। সারা দেশে গত পাঁচ বছরে ৬৫ লক্ষ ৭০ হাজারের বেশি শিশু স্কুল ছুট হয়েছে প্রাথমিক স্তরেই। তার মধ্যে শুধু গুজরাটে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ২.৪ লক্ষ শিশু স্কুল ছেড়েছে। আসমে এক বছরে স্কুল ছুট ১.৫ লক্ষ শিশু, উত্তবপ্রদেশে ৯৯ হাজার। বিজেপি শাসিত এই তিনটি রাজ্যই শিশুদের বিশেষত মেয়েদের স্কুলছুটে ভারতে প্রথম। (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭.০১.২০২৬)

ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে দুর্নীতির বহর

বিজেপি ঃ ২০২৪-এ উত্তরপ্রদেশের ৬৯০০০ শিক্ষকের নিয়োগ লক্ষ্ণৌ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দুর্নীতির দায়ে বাতিল করে দিয়েছে। গোয়াতে বিজেপি নেতারা কী ভাবে টাকা নিয়ে চাকরি বেচেছে তা স্পষ্ট ভাবে উঠে এসেছে সংবাদমাধ্যমে। (দ্য হিন্দু ১৭.০৮.২০২৪, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১৫.১১.২০২৪)। বিহারের পরীক্ষা ও চাকরি কেলেঙ্কারির তদন্তকারী সাংবাদিক সহ একাধিক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু রহস্যের তদন্ত হয়নি।

মধ্যপ্রদেশ ঃ ব্যপম কেলেঙ্কারি —সরকারি চাকরি ও মেডিকেল সহ লোভনীয় পেশাগত শিক্ষায় সুযোগ পেতে বহু কোটি টাকার ঘুষের কারবারে অভিযুক্ত শিবরাজ সিং চৌহান সহ বহু বিজেপি নেতা।

ছত্তিশগড় ঃ ৩৬ হাজার কোটি টাকার রেশন কেলেঙ্কারিতে ছত্তীশগড়ের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংহ সহ অভিযুক্ত বহু বিজেপি নেতা।

রাজস্থান ঃ ৪৫ হাজার কোটি টাকার খনি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হয়েছেন বিজেপি নেত্রী বসুন্ধরা রাজে ও ললিত মোদী। এই বসুন্ধরা রাজের সহযোগিতাতেই ব্যাঙ্ক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করা ললিত মোদী বিদেশে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গুজরাট ঃ স্টেট পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ২০ হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে

জড়িত গুজরাটের একাধিক বিজেপি নেতা ও মন্ত্রী। (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ জুলাই, ২০১৭)

উপরোক্ত অভিযুক্তরা হয় সিবিআই থেকে ক্লিনচিট পেয়েছেন, নয়তো বহু বছর ধরে তদন্ত থমকে রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের পর থেকে বিজেপি শাসিত রাজ্যে সিবিআই ও ইডি আর কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত বিজেপি নেতা ও মন্ত্রীর হদিশ পাচ্ছে না। আর অন্যান্য দলের দুর্নীতিতে অভিযুক্তরা বাঁচার জন্য বিজেপি-তে ঠাঁই নিয়ে নিশ্চিন্তে দিন যাপন করছেন।

দেশবাসীর মাথায় বিপুল ঋণের বোঝা

সরকারকে এ বার খরচ ও রাজস্ব আয়ের ফারাক মেটাতে ১৭ লক্ষ কোটি টাকা ধার করতে হবে। এর মধ্যে ১৪ লক্ষ কোটি টাকাই যাবে মোট ঋণের সুদ গুনতে। আগামী অর্থ বছরে মোট ঋণের পরিমাণ ২১৪ লক্ষ কোটি টাকা ছাপিয়ে যাবে। যা ২০১৪ সালের ঋণের তুলনায় প্রায় চার গুণ। এর অর্থ জনগণের ওপর কর চাপিয়ে সরকারের হাতে যে অর্থ আসবে তা জনস্বার্থে— অর্থাৎ স্কুল কলেজ হাসপাতাল রেলপথ রাস্তাঘাট তৈরিতে খরচ করা হবে না, ঋণের সুদ মেটাতেই খরচ হবে।

দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের তৈরি অস্ত্র কিনতেই বাজেটে সবচেয়ে বেশি টাকা

অর্থনীতির এই সামরিকীকরণের নীতির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে ২০২৬-২৭ সালের বাজেটে। গত বছরের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের জন্য ধার্য হয়েছিল মোট ৬.৮১ লক্ষ কোটি টাকা। এ বার ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বাড়িয়ে করা হল ৭.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা, যা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ১১ শতাংশ। এর মধ্যে প্রায় ২.১৯ লক্ষ কোটি টাকা আধুনিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজে ব্যয় করা হবে।

জনগণের জন্য ভরতুকি কমেই চলেছে

গোটা বাজেট জুড়ে যখন পুঁজিপতিদের জন্য অজস্র উপঢৌকনের ব্যবস্থা তখন জনগণের জন্য বিভিন্ন খাতে যে সামান্য পরিমাণ ভর্তুকিটুকু দেওয়া হত তাকেও ক্রমাগত কমিয়ে আনছে সরকার। বাজেটে খাদ্য, সার এবং জ্বালানির ভর্তুকি কমানোর কথা জানিয়ে দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। গত বারের ৪,২৯,৭৩৫ কোটি থেকে এর পরিমাণ ৪.৪৭ শতাংশ কমিয়ে এ বার করা হয়েছে ৪,১০,৪৯৫ কোটি টাকা।

প্রতিটি নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতির চমক নির্বাচন শেষে মুখে কুলুপ

২০১৪ সালে নির্বাচনের আগে বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে কালো টাকা উদ্ধার এবং প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা ও বছরে দুই কোটি বেকারের চাকরি দেওয়ার মোদীজির চমকপ্রদ প্রতিশ্রুতি। নির্বাচনের পরে এ নিয়ে মুখে আর কোনও কথা নেই। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কৃষকের আয় ২০২২ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতির কথা তিনি আর উচ্চারণ করনেনি।

সবচেয়ে বেশি অনুদান প্রাপক ধনকুবেররা

অনুদানের জন্যই রাজকোষ ঘাটতি, বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী গত বাজেটে বলেছেন রাজ্যগুলো সব মিলিয়ে ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার অনুদান দেয়। কেন্দ্রীয় নানা ওয়েলফেয়ার স্কিম ধরে তা মোট ৭ লক্ষ কোটি টাকার কাছে। কিন্তু দেশে সবচেয়ে বেশি অনুদান প্রাপক কারা? কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার বৃহৎ পুঁজি মালিকদের কর্পোরেট কর কমাচ্ছে প্রতি বছর।

এর পরেও গত বছর ৪ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি কর্পোরেট কর সরকার মকুব করেছে। এসইজেড, আর্ন্তজাতিক আর্থিক লেনদেনের জন্য (আইএফএসসি) কোম্পানিদের ১০০ শতাংশ পর্যন্ত কর ছাড় দিয়েছে। গত ৫ বছরে ৬ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ ব্যাঙ্কের খাতা থেকে 'রাইট অফ' করে মুছে দিয়েছে। এর বেশিরভাগটাই নিয়েছিল দেশের ধনকুবেররা। একেবারে বিনা পয়সায় বা এক টাকায় হাজার হাজার একর জমি, বিদ্যুৎ, জল, কয়লা, খনিজ সম্পদ সরকার কর্পোরেট পুঁজিমালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে।

একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফা আকাশছোঁয়া

টাটাদের মুনাফা গত অর্থ বছরে ১ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি, আম্বানিদের ৮১ হাজার ৩০৯ কোটি, আদানিদের ৪০ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা। মালিকদের এত সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও কি কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি বেড়েছে?

বিপুল সংখ্যক সরকারি পদ খালি

কেন্দ্রীয় সরকারের মোট পদের ২৫ শতাংশই খালি। এর পরিমাণ ৯ লক্ষ ৭০ হাজার। রেলে প্রায় ৩ লক্ষ পদ বিলোপের পরেও আরও ২ লক্ষ ৬০ হাজার পদ খালি।

গরিবের আয় কমছে

পারিবারিক আয়ের সরকারি সমীক্ষা দেখাচ্ছে ২০২৩-২৪-এ দেশের ১০ শতাংশ বা প্রায় ১৪ কোটির বেশি মানুষের মাথাপিছু আয় মাসে মাত্র ৮৪৯ টাকা। আর সর্বোচ্চ আয়ের ১০ শতাংশের গড় হল মাথাপিছু মাসে ২০,৫৯৯ টাকা (সিএমআইই তথ্য, পিপলস আরকাইভ ফর রুরাল ইন্ডিয়ার সংগৃহীত)। মনে রাখা দরকার এই গড় আয়ের মধ্যে মুকেশ আম্বানির ঘণ্টায় ৯০ কোটি টাকা আয়, সরকারি উচ্চপদস্থ অফিসার মন্ত্রী সাংসদদের বিপুল বেতনের সাথে একই সাথে ধরা আছে খেটে খাওয়া মানুষের রোজগারও!

অপুষ্টিতে শিশুরা

ভারত চরম অপুষ্টিতে ভোগা, খর্বকায় ও অত্যন্ত কম ওজনের শিশুর সংখ্যায় বিশ্বে সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছে (প্রায় ৫ কোটি)। অপুষ্ট শিশুর সংখ্যাতেও ভারত বিশ্বে সর্বোচ্চ (২ কোটি ১০ লক্ষ)।

বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে নারী সুরক্ষার নমুনা!

২০২৪ সালের ৩ জুলাই মধ্য প্রদেশ বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি পরিচালিত সরকার জানায়— ২০২১ থেকে ২০২৪, এই তিন বছরে ওই রাজ্যে ২৮ হাজার ৮৫৭ জন মহিলা ও ২৯৪৪ জন নাবালিকা নিখোঁজ হয়েছে। অর্থাৎ তিন বছরে মোট নিখোঁজের সংখ্যা ৩১ হাজার ৮০১ জন। গড়ে প্রতি দিন নিখোঁজ ৩১ জন। (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১)

নির্ভয়া তহবিলের অর্থ খরচই সার, বছরে গড়ে ধর্ষিতা প্রায় ২৯ হাজার

আর জি কর কাণ্ডে দেশজুড়ে চলছে প্রতিবাদ। ঠিক একই ভাবে দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় তুলে দিয়েছিল ২০১২ সালে দিল্লিতে নির্ভয়া গণধর্ষণের মামলা। গোটা দেশে মহিলাদের নিরাপত্তা বাড়াতে ২০১৩ সালে গঠিত হয়েছিল নির্ভয়া তহবিল। এই তহবিলের টাকা খরচে সুপারিশের জন্য ২০১৫ সালে গড়া হয়েছিল বিশেষজ্ঞ কমিটি। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও বাস্তব পরিস্থিতি কতটা বদলেছে? ২০১৫ সালে ওই কমিটি গঠনের পর বছরে গড়ে ২৮ হাজার ৯৭২টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর (এনসিআরবি) তরফে এই তথ্যই সামনে এসেছে। নির্ভয়া তহবিলে বরাদ্দ সত্ত্বেও ২০১৫ থেকে ২০২২ পর্যন্ত দেশের সামাজিক পরিসংখ্যান বলছে, ধর্ষণের মামলা কমেছে মাত্র ৯ শতাংশ। (বর্তমান ঃ ২২.০৮.'২৪)

নারী নিগ্রহকারী ও ধর্ষকদের রক্ষায় বিজেপি

১) উত্তর প্রদেশের হাথরসে দলিত কিশোরী গণধর্ষিতা মৃত্যুর আগে জবানবন্দিতে অপরাধীর নাম বলা সত্ত্বেও ক্রিমিনালরা বিজেপির দ্বারা সুরক্ষিত।

২) বিজেপির এমএলএ কুলদীপ সেঙ্গার তার দলবল নিয়ে একটি দরিদ্র মেয়েকে চাকরির সুযোগ দেওয়ার নাম করে একাধিকবার ধর্ষণ করে। মেয়েটির বাবা পুলিশে অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ মিথ্যা অভিযোগে তার বাবাকেই আটক করে। বিজেপি তাদের এমএলএ-র পক্ষ নিয়ে মিছিল করে।

৩) জম্মুতে যাযাবর জাতির এক শিশু কন্যাকে ধর্ষণ ও খুনে যারা অভিযুক্ত, তাদের পক্ষ নিয়ে দলবল সহ মিছিল করেছে বিজেপির জম্মুর এমএলএ ও ওই রাজ্যের মন্ত্রী।

৪) বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্বামী চিন্মায়ানন্দের বিরুদ্ধে এক কলেজ ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগ করলে, তার উপর চাপ দেওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়। অবশেষে মেয়েটি অভিযোগ তুলে নিতে বাধ্য হয়।

৫) বিজেপির এমপি ও ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং মহিলা কুস্তিগীরদের নিগ্রহ করতেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় মহিলা কুস্তিগীর ভিনেশ

ফোগাত, সাক্ষী মালিকরা প্রতিবাদ জানান। দেশের বিবেক আলোড়িত হলেও দেশের প্রধানমন্ত্রী সহ কোনও বিজেপি নেতা টু-শব্দটি পর্যন্ত করেননি। বিজেপির সৌজন্যে ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং সুরক্ষিতই রয়েছেন।

৬) গুজরাটে বিলকিস বানোকে ধর্ষণের মামলায় ১১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কারসাজিতে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা, সেই ধর্ষকদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে বিজেপের লোকেরা।

৭) ধর্ষক আশারাম বাপু, ধর্ষক গুরমিত রাম রহিম —এরা ধর্ষক প্রমাণিত হওয়ার পর বিজেপি তাদের সমস্ত রকম সাহায্য করে যাচ্ছে। বেশির ভাগ সময় এই ধর্ষকদের প্যারোলে জেলের বাইরে থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

এইগুলি শুধু কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ মাত্র।

ধারাবাহিক ভাবে নাগরিক হয়রানিই বিজেপি-র শাসনের বৈশিষ্ট্য

৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করে হয়রানি ও ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে শতাধিক মানুষের মৃত্যু, আসামে এনআরসি করে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্কের হয়রানি, করোনা প্রতিরোধের নামে 'জনতা কার্ফু' জারি, তার একদিন বাদেই কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিক, লক্ষ লক্ষ পর্যটক, ভিন রাজ্যে পড়তে যাওয়া ছাত্রছাত্রী, চিকিৎসা করাতে যাওয়া রোগী সহ অসংখ্য মানুষকে বাড়ি ফেরার সুযোগ না দিয়ে পুরো দেশজুড়ে লক ডাউন ঘোষণা করে চরম হয়রানি, এসআইআর-এর নামে হয়রানি ও শতাধিক মানুষের মৃত্যু। এর পর অমিত শাহ-র ক্রোনোলজি অনুযায়ী সারা দেশেই হবে এনআরসি। হবে কোটি কোটি মানুষের হয়রানি। ধারাবাহিক নাগরিক হয়রানিই বিজেপি-র শাসনের বৈশিষ্ট্য।

বিজেপির 'ডবল ইঞ্জিনের' পারফরমেন্স

সাক্ষরতায় সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা চারটি রাজ্য

অন্ধ্রপ্রদেশ (ডবল ইঞ্জিন) বিহার (ডবল ইঞ্জিন)
মধ্যপ্রদেশ (ডবল ইঞ্জিন) রাজস্থান (ডবল ইঞ্জিন)

সূত্র ঃ পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে ২০২৪-২৫

স্কুল ড্রপ আউটে এগিয়ে থাকা চারটি রাজ্য

বিহার (ডবল ইঞ্জিন) আসাম (ডবল ইঞ্জিন)
রাজস্থান (ডবল ইঞ্জিন) উত্তরপ্রদেশ (ডবল ইঞ্জিন)

সূত্র ঃ ইউডিআইএসই, পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে ২০২৩-২৪

শিশু অপুষ্টিতে এগিয়ে থাকা চারটি রাজ্য

উত্তরপ্রদেশ (ডবল ইঞ্জিন) বিহার (ডবল ইঞ্জিন)
মধ্যপ্রদেশ (ডবল ইঞ্জিন) গুজরাট (ডবল ইঞ্জিন)

সূত্র ঃ এনএফএইচএস ২০১৯-২১

দারিদ্রে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা চারটি রাজ্য

বিহার (ডবল ইঞ্জিন) ঝাড়খণ্ড
উত্তরপ্রদেশ (ডবল ইঞ্জিন) মধ্যপ্রদেশ (ডবল ইঞ্জিন)

সূত্র ঃ পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে ২০২৫

সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা চারটি রাজ্য

উত্তরপ্রদেশ (ডবল ইঞ্জিন) বিহার (ডবল ইঞ্জিন)
মধ্যপ্রদেশ (ডবল ইঞ্জিন) ওড়িশা (ডবল ইঞ্জিন)

বেকারত্বের হারে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা চারটি রাজ্য

হরিয়ানা (ডবল ইঞ্জিন) রাজস্থান (ডবল ইঞ্জিন)
গুজরাট (ডবল ইঞ্জিন) মধ্যপ্রদেশ(ডবল ইঞ্জিন)

সূত্র ঃ সিএমআইই রিপোর্ট

ধর্ষণের ঘটনায় সবচেয়ে এগিয়ে থাকা চারটি রাজ্য

রাজস্থান (ডবল ইঞ্জিন) মধ্যপ্রদেশ (ডবল ইঞ্জিন)
উত্তরপ্রদেশ (ডবল ইঞ্জিন) মহারাষ্ট্র (ডবল ইঞ্জিন)

সূত্র ঃ হিন্দুস্থান টাইমস (২০২১)

দলিতদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় এগিয়ে থাকা চারটি রাজ্য

উত্তরপ্রদেশ (ডবল ইঞ্জিন) বিহার (ডবল ইঞ্জিন)
রাজস্থান (ডবল ইঞ্জিন) মধ্যপ্রদেশ (ডবল ইঞ্জিন)

সূত্র ঃ পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে ২০২২

কৃষক আত্মহত্যায় এগিয়ে থাকা চারটি রাজ্য

মহারাষ্ট্রে (ডবল ইঞ্জিন) কর্নাটক
অন্ধ্রপ্রদেশ (ডবল ইঞ্জিন) মধ্যপ্রদেশ (ডবল ইঞ্জিন)

সূত্র ঃ এনসিআরবি ২০২২

সার্বিক অপরাধের হারে দেশের প্রথম চারটে রাজ্য

উত্তরপ্রদেশ (ডবল ইঞ্জিন) অরুণাচলপ্রদেশ (ডবল ইঞ্জিন)
ঝাড়খণ্ড দিল্লি (ডবল ইঞ্জিন)

সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৬ মে, ২০২৫

২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থী তালিকা

কোচবিহার

১) হিতেন বর্মন (মেখলিগঞ্জ), ২) বিকাশ বর্মন (মাথাভাঙা), ৩) স্বপন কুমার বর্মন (কোচবিহার উত্তর), ৪) সুমন পণ্ডিত (কোচবিহার দক্ষিণ), ৫) জগদীশ চন্দ্র অধিকারী (শীতলকুচি), ৬) বীণাপাণি রায় (সিতাই), ৭) আজিজুল হক (দিনহাটা), ৮) আবদুস সালাম (নাটাবাড়ি), ৯) ভোলা সাহা (তুফানগঞ্জ)

আলিপুরদুয়ার

১০) কিরানী চিক বড়াইক (কালচিনি), ১১) পীযূষকান্তি শর্মা (আলিপুরদুয়ার), ১২) উকিল চন্দ্র ভুঁইমালি (ফালাকাটা), ১৩) গোপাল খেশ (মাদারিহাট)

জলপাইগুড়ি

১৪) প্রিয়া রায় (ধূপগুড়ি), ১৫) শ্যামল রায় (ময়নাগুড়ি), ১৬) যশোদা বর্মন (জলপাইগুড়ি) ১৭) অনন্ত রায় (রাজগঞ্জ), ১৮) শিবনাথ ওরাওঁ (মাল), ১৯) রাজেশ ওরাওঁ (নাগরাকাটা)

২০) রেনুকা রায় (ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি)

দার্জিলিং

২১) লক্ষ্মী দাস (মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি), ২২) ডাঃ শাহরিয়ার আলম (শিলিগুড়ি), ২৩) প্রকাশ লাকরা (ফাঁসিদেওয়া)

উত্তর দিনাজপুর

২৪) বীরেন্দ্রনাথ সিংহ (ইসলামপুর), ২৫) নবীন চন্দ্র সিংহ (গোয়ালপোখর), ২৬) পরে জানানো হবে (চাকুলিয়া), ২৭) সুশান্ত সিংহ (করণদিঘি), ২৮) প্রবোধ সরকার (হেমতাবাদ) ২৯) ধূলেষ সরকার (কালিয়াগঞ্জ), ৩০) মাধবীলতা পাল (রায়গঞ্জ), ৩১) তপন দাস (ইটাহার)

দক্ষিণ দিনাজপুর

৩২) রণজিৎ দেব (কুমারগঞ্জ), ৩৩) নমিতা মহন্ত (বালুরঘাট), ৩৪) বিকাশ নোনা (তপন) ৩৫) অমৃত বর্মন (গঙ্গারামপুর), ৩৬) ললিত ওরাওঁ (হরিরামপুর)

মালদা

৩৭) বিমল মুর্মু (হাবিবপুর), ৩৮) সুপেন কুমার রায় (গাজল), ৩৯) ঝন্টু কুমার রবিদাস (চাঁচল), ৪০) মুশারফ হোসেন (হরিশ্চন্দ্রপুর), ৪১) গৌতম সরকার (ইংলিশ বাজার) ৪২) আনন্দ ঘোষ (বৈষ্ণব নগর), ৪৩) বাসুদেব সরকার (মালদা)

মুর্শিদাবাদ

৪৪) রবিউল হক (সামসেরগঞ্জ), ৪৫) অনুপ সিনহা (সুতি), ৪৬) মির্জা নাসিরুদ্দিন (জঙ্গিপুর), ৪৭) রবিউল আলম (রঘুনাথগঞ্জ), ৪৮) মির্জা লুতফল হক (সাগরদিঘি), ৪৯) মুনতাসির জামিল (লালগোলা), ৫০) ওমর খৈয়াম (ভগবানগোলা), ৫১) শ্যামল মণ্ডল (রানিনগর), ৫২) মিলিয়া সাজেম (মুর্শিদাবাদ), ৫৩) বরুণ মণ্ডল (নবগ্রাম), ৫৪) শ্রীকান্ত দাস (কান্দি), ৫৫) বাবর আলি (রেজিনগর), ৫৬) সরিফুল ইসলাম (বেলডাঙা) ৫৭) দিলীপ দাস (বহরমপুর), ৫৮) আবু সায়ীদ খন্দকার (হরিহরপাড়া), ৫৯) আবদুস সালাম (নওদা), ৬০) আয়েশা সিদ্দিকা (ডোমকল), ৬১) এনামুল হক (জলঙ্গি)

নদিয়া

৬২) ধনপতি মণ্ডল (করিমপুর), ৬৩) নাজমুল আনসারি (তেহট্ট), ৬৪) আনারুল হক (পলাশিপাড়া), ৬৫) মহিউদ্দিন মণ্ডল (কালীগঞ্জ), ৬৬) মশিকুর রহমান (নাকাশিপাড়া) ৬৭) মোজাম্মেল হোসেন মণ্ডল (চাপড়া), ৬৮) জয়দীপ চৌধুরী (কৃষ্ণনগর উত্তর), ৬৯) প্রবীর দে (কৃষ্ণনগর দক্ষিণ), ৭০) অপর্ণা গুহ (রানাঘাট উত্তর পশ্চিম), ৭১) অসিত বরণ বিশ্বাস (কৃষ্ণগঞ্জ), ৭২) জগদীশ মণ্ডল (রানাঘাট উত্তর পূর্ব), ৭৩) ননী গোপাল মিস্ত্রী (রানাঘাট দক্ষিণ), ৭৪) অর্চনা ভট্টাচার্য (চাকদহ), ৭৫) প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস (কল্যাণী), ৭৬) বিপ্লব দাস (হরিণঘাটা)

উত্তর ২৪ পরগণা

৭৭) স্বপন মণ্ডল (বাগদা), ৭৮) শ্যামসুন্দর হালদার (বনগাঁ উত্তর), ৭৯) রবীন্দ্রনাথ বারুই (বনগাঁ দক্ষিণ), ৮০) শিবানী মজুমদার (গাইঘাটা), ৮১) প্রবোধ সরকার (হাবড়া), ৮২) তারক দাস (অশোকনগর), ৮৩) কামাল উদ্দিন (আমডাঙা), ৮৪) অভিজিৎ মুখার্জী (বারাসাত), ৮৫) সাদেক মণ্ডল (দেগঙ্গা), ৮৬) দেবব্রত বিশ্বাস (স্বরূপনগর), ৮৭) নিতাই

কৃষ্ণ পাল (বাদুড়িয়া), ৮৮) হিরণ্ময় মণ্ডল (বসিরহাট দক্ষিণ), ৮৯) অপর্ণা বিশ্বাস (মধ্যমগ্রাম) ৯০) সীমা নন্দী (বীজপুর), ৯১) সঞ্জয় রায় (নৈহাটি), ৯২) সুজিত বোস (ভাটপাড়া), ৯৩) প্রণব চৌধুরী (জগদ্দল), ৯৪) চন্দ্রশেখর চৌধুরী (পানিহাটি), ৯৫) অমল সেন (ব্যারাকপুর), ৯৬) নীরেন কর্মকার (দমদম), ৯৭) সুনীল নস্কর (রাজারহাট নিউটাউন) ৯৮) উমা পণ্ডা (বিধাননগর), ৯৯) সুপ্রিয় ভট্টাচার্য (বরানগর), ১০০) সুবীর চৌধুরী (রাজারহাট গোপালপুর)

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

১০১) হরিপদ মণ্ডল (গোসাবা), ১০২) মিলন বিশ্বাস (বাসন্তী), ১০৩) রামপ্রসাদ মিস্ত্রি (ক্যানিং পশ্চিম), ১০৪) রফিক আকুঞ্জি (ক্যানিং পূর্ব), ১০৫) নারায়ণচন্দ্র হালদার (পাথরপ্রতিমা), ১০৬) ঝন্টু মাইতি (কাকদ্বীপ), ১০৭) অনুপম পানি (সাগর), ১০৮) যমুনা তাঁতি (কুলপী), ১০৯) নিরঞ্জন নস্কর (জয়নগর), ১১০) জয়দেব নস্কর (বারুইপুর পূর্ব), ১১১) প্রদ্যুৎ চক্রবর্তী রিন্টুদা (বারুইপুর পশ্চিম), ১১২) শঙ্কর নস্কর (কুলতলী) ১১৩) গুণসিন্ধু হালদার (রায়দিঘি), ১১৪) শিশির মণ্ডল (মন্দিরবাজার), ১১৫) সোমনাথ নস্কর (মগরাহাট পূর্ব), ১১৬) গোরা জমাদার (মগরাহাট পশ্চিম), ১১৭) শম্পা সরকার (কসবা), ১১৮) অধ্যাপক দেবব্রত বেরা (যাদবপুর), ১১৯) অনিন্দ্য রায়চৌধুরী (সোনারপুর উত্তর), ১২০) মিনতি মিত্র (সোনারপুর দক্ষিণ), ১২১) সুমিতা ব্যানার্জী মুখার্জী (টালিগঞ্জ) ১২২) আশীষ সামন্ত (বেহালা পূর্ব), ১২৩) সঞ্জয় বিশ্বাস (বেহালা পশ্চিম), ১২৪) সঙ্গীতা ভক্ত (মহেশতলা), ১২৫) বাসুদেব কাবড়ি (বজবজ), ১২৬) রীণা রায় (মেটিয়াবুরুজ), ১২৭) উত্তম পাল (সাতগাছিয়া)

কলকাতা

১২৮) শ্রীচাঁদ বিন্দ (কলকাতা পোর্ট), ১২৯) অনুমিতা সাউ (পানি) (ভবানীপুর), ১৩০) দিলীপ হালদার (রাসবিহারী), ১৩১) আয়সানুল হক (বালিগঞ্জ), ১৩২) প্রবীর শীল (চৌরঙ্গী) ১৩৩) ডাঃ সামস মুসাফির (এন্টালি), ১৩৪) জয়ন্তী মিত্র (বেলেঘাটা), ১৩৫) ডাঃ অংশুমান মিত্র (জোড়াসাঁকো), ১৩৬) অধ্যাপক গৌরাঙ্গ খাটুয়া (শ্যামপুকুর), ১৩৭) সুবীর সামন্ত (মানিকতলা), ১৩৮) ডাঃ নীলরতন নাইয়া (কাশীপুর বেলগাছিয়া)

হাওড়া

১৩৯) পুতুল চৌধুরী (বালি), ১৪০) শ্রীরূপ দাস (হাওড়া মধ্য), ১৪১) কার্তিক শীল (শিবপুর), ১৪২) রীতা ঘোষাল (হাওড়া দক্ষিণ), ১৪৩) সুখেন মণ্ডল (উলুবেড়িয়া পূর্ব) ১৪৪) জয়ন্ত খাটুয়া (উলুবেড়িয়া দক্ষিণ), ১৪৫) অলোক দলপতি (শ্যামপুর), ১৪৬) বিশ্বনাথ বেরা (বাগনান), ১৪৭) সঞ্জীব সাঁতরা (আমতা)

হুগলি

১৪৮) তপন চৌধুরী (উত্তরপাড়া), ১৪৯) সমীর সরকার (শ্রীরামপুর), ১৫০) সুকান্ত পোড়েল (সিঙ্গুর), ১৫১) শুকদেব বিশ্বাস (বলাগড়), ১৫২) শ্যামলী কুমার (পাণ্ডুয়া), ১৫৩) বিশ্বনাথ ঘোষ (হরিপাল), ১৫৪) কুমুদ মণ্ডল (চন্দননগর)

পূর্ব মেদিনীপুর

১৫৫) অরুণ জানা (তমলুক), ১৫৬) আনন্দ হাণ্ডা (পাঁশকুড়া পূর্ব), ১৫৭) স্নেহলতা সাহু (পাঁশকুড়া পশ্চিম), ১৫৮) জগদীশ মাইতি (ময়না), ১৫৯) সৌমিত্র পট্টনায়ক (নন্দকুমার) ১৬০) তপন মাইতি (মহিষাদল), ১৬১) শুভেন্দু শেখর দাস (হলদিয়া), ১৬২) বিমল কুমার মাইতি (নন্দীগ্রাম), ১৬৩) রীতা ভৌমিক (চণ্ডীপুর), ১৬৪) সূর্যেন্দু পাত্র (পটাশপুর) ১৬৫) সুভাষ পয়রা (কাঁথি উত্তর), ১৬৬) গোপাল পাত্র (ভগবানপুর), ১৬৭) পবিত্র মণ্ডল (খেজুরি), ১৬৮) রফিকুল ইসলাম (কাঁথি দক্ষিণ), ১৬৯) নারায়ণ বর্মন (রামনগর), ১৭০) সনাতন গিরি (এগরা)

ঝাড়গ্রাম

১৭১) কালীচরণ বেসরা (নয়াগ্রাম), ১৭২) ধর্মপাল বিশুই (গোপীবল্লভপুর), ১৭৩) সুভাষ সিংহ (ঝাড়গ্রাম), ১৭৪) রাজীব মুদি (বিনপুর)

পশ্চিম মেদিনীপুর

১৭৫) সুভাষ দাস (দাঁতন), ১৭৬) সুনীল সিং (কেশিয়াড়ি), ১৭৭) শ্যামাপদ জানা (নারায়ণগড়), ১৭৮) সুরঞ্জন মহাপাত্র (খড়গপুর সদর), ১৭৯) তপন শাসমল (সবং), ১৮০) শিশির মান্না (পিংলা), ১৮১) অক্ষয় খান (খড়গপুর), ১৮২) দীপঙ্কর মাইতি (ডেবরা) ১৮৩) অঞ্জন জানা (চন্দ্রকোণা), ১৮৪) তাপস মিশ্র (গড়বেতা), ১৮৫) ঝর্ণা জানা (শালবনী) ১৮৬) হারাধন সিং (কেশপুর), ১৮৭) সুশ্রীতা সোরেন (মেদিনীপুর), ১৮৮) নাড়ুগোপাল দোলোই (ঘাটাল), ১৮৯) জগদীশ মণ্ডল অধিকারী (দাসপুর)

পুরুলিয়া

১৯০) পরে জানানো হবে (বান্দোয়ান), ১৯১) ভোলানাথ মুর্মু (বলরামপুর), ১৯২) পরিতোষ সিং বাবু (বাঘমুণ্ডি), ১৯৩) সুফল কুমার (জয়পুর), ১৯৪) শোভা মাহাত (পুরুলিয়া), ১৯৫) স্বপন মুর্মু (মানবাজার), ১৯৬) দীপক মাহাতো (কাশীপুর), ১৯৭) জগন্নাথ বাউরী (পাড়া), ১৯৮) অনিল বাউরী (রঘুনাথপুর)

বাঁকুড়া

১৯৯) দীপেন বাউরী (শালতোড়া), ২০০) অবিনাশ হাঁসদা (ছাতনা), ২০১) রঞ্জনলাল টুডু (রানিবাঁধ), ২০২) গুণারাম হাঁসদা (রায়পুর, বাঁকুড়া), ২০৩) শুভেন্দু মাহাত (তালডাংরা), ২০৪) লীনা ঘোষ (বাঁকুড়া), ২০৫) প্রদীপ বাউরী (বড়জোড়া), ২০৬) মাগারাম ঘোষ (ওন্দা), ২০৭) শশীভূষণ ব্যানার্জী (বিষ্ণুপুর), ২০৮) মোহন সাঁতরা (কোতুলপুর), ২০৯) দিলীপ সাহা (সোনামুখী)

পূর্ব বর্ধমান

২১০) অধ্যাপিকা ঝর্ণা পাল (বর্ধমান দক্ষিণ), ২১১) অতসী পাকড়ে (জামালপুর), ২১২) নীলরতন বিশ্বাস (কালনা), ২১৩) অপূর্ব চক্রবর্তী (কাটোয়া), ২১৪) সত্যনারায়ণ মণ্ডল (কেতুগ্রাম), ২১৫) রসিক সোরেন (মঙ্গলকোট), ২১৬) মনসা মেটে (আউশগ্রাম), ২১৭) প্রভাত মাঝি (পূর্বস্থলী দক্ষিণ)

পশ্চিম বর্ধমান

২১৮) দনা গোস্বামী (পাণ্ডবেশ্বর), ২১৯) কিরণময়ী মণ্ডল (দুর্গাপুর পূর্ব), ২২০) সোমনাথ ব্যানার্জী (দুর্গাপুর পশ্চিম), ২২১) অনুপ ভট্টাচার্য (আসানসোল দক্ষিণ), ২২২) কল্লোল রায় (আসানসোল উত্তর), ২২৩) দেবসর বেসরা (বারাবনি)

বীরভূম

২২৪) নিতাই অঙ্কুর (সিউড়ি), ২২৫) সমরজিৎ বর্মন (বোলপুর), ২২৬) নব কুমার দাস (সাঁইথিয়া), ২২৭) ফরিদা ইয়াসমিন (রামপুরহাট), ২২৮) সুবর্ণ মাল (হাসন), ২২৯) মার্শাল হেমব্রম (নলহাটি), ২৩০) বাঞ্ছারাম মাল (মুরারই)

দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতায় ট্রাক্টর মিছিল। ২৬ জানুয়ারি ২০২১

গণআন্দোলনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের সাম্প্রদায়িক নীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ
২২ জুন ২০১৪

ডেঙ্গু জ্বরে মৃত্যুর প্রতিবাদে কলকাতায় পুরসভার কেন্দ্রীয় দফতরে বিক্ষোভ।
১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে আইন অমান্যে লাঠিচার্জ। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে আইন অমান্য আন্দোলনে
পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জ। ২৯ জুন ২০২২

বিহারে শতাধিক শিশু মৃত্যুর প্রতিবাদে কলকাতায় রাজভবন অভিযান।
২৪ জুন ২০১৯

সেনাবাহিনীতে অস্থায়ী অগ্নিবীর নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করছে পুলিশ। ২৯ জুন ২০২২